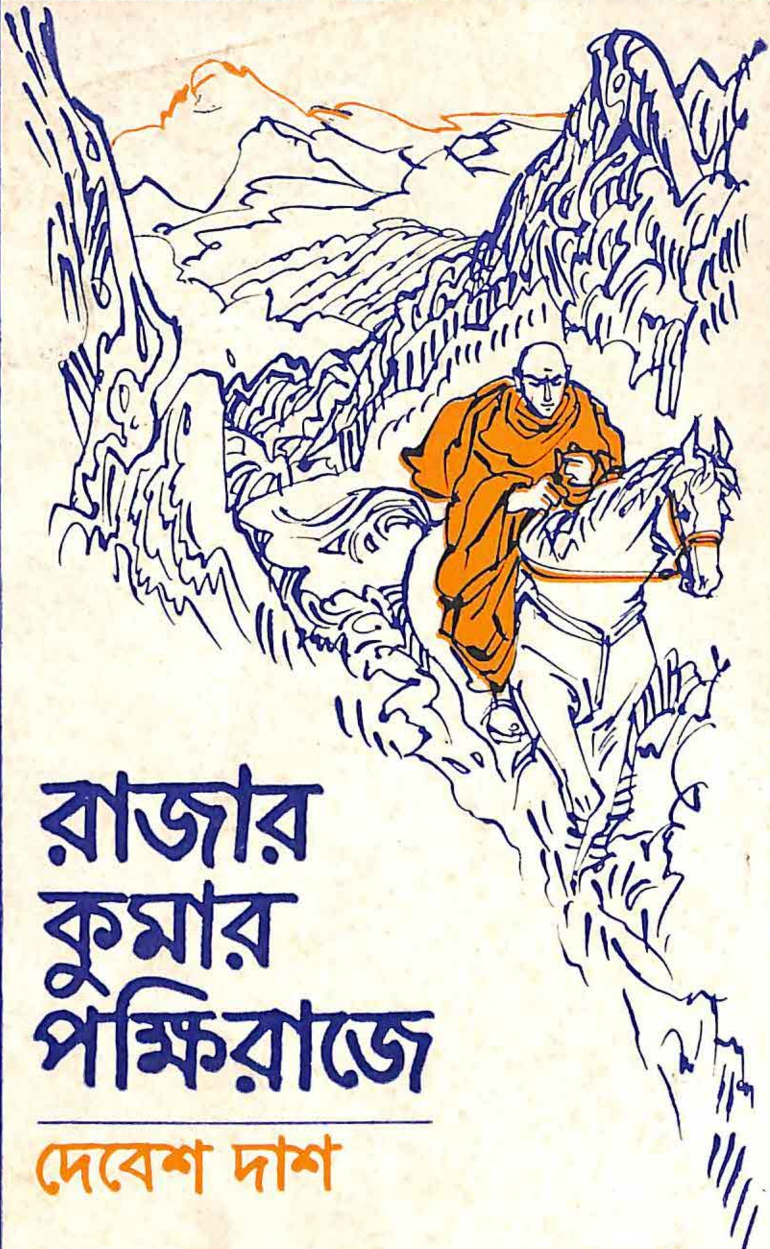
কিশোরপ্রিয় গ্রন্থমালা



রাজার কুমার পক্ষিরাজে

দেবেশ দাশ

রাজার কুমার পক্ষিরাজে

দেবেশ দাশ

ওরিয়েন্ট লংম্যান

ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড
ISBN 0 86131 911 7
রেজিস্টার্ড অফিস
৩-৬-২৭২ হিমায়াৎ নগর, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯

অন্যান্য অফিস
কামানি মার্গ, ব্যালার্ড এস্টেট্, বোম্বাই ৪০০ ০৩৮
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০ ০৭২
১৬০ আন্না সালাই, মাদ্রাজ ৬০০ ০০২
১/২৪ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০ ০০২
৮০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০০১
৩-৬-২৭২ হিমায়াৎ নগর, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯
বিড়লা মন্দির রোড, পাটনা ৮০০ ০০৪
এস্ সি গোস্বামী রোড, পানবাজার, গুয়াহাটি ৭৮১ ০০১
'পাতিয়ালা হাউস', ১৬এ অশোক মার্গ, লক্ষ্ণৌ ২২৬ ০০১

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৯

প্রকাশক
ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড
১৭, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ৭০০ ০৭২

—মুদ্রণ—
নটরাজ অফসেট
১৭৯ এ/১বি মাণিকতলা মেন রোড
কলিকাতা—৭০০০৫৪

অনু ও ভরতকে

THE DALAI LAMA

THEKCHEN CHOELING
McLEOD GANJ 176219
KANGRA DISTRICT
HIMACHAL PRADESH

P R E F A C E

Tibetan Buddhists revere Dipankara Srijnan Atisha for his profound wisdom and for having taught us the path to practise the Buddha's teachings without any contradiction.

Atisha was invited to Tibet at a time when Tibetan Buddhism was just beginning to re-establish itself after having declined during the rule of King Lang Dharma. Through his sagacity he was able to contribute greatly in refining Tibetan Buddhism and helping it to spread further.

I welcome Mr. Debesh Das' book on Atisha which will be one more addition to the very many written on the great master. I am sure it will help in spreading the awareness of the age-old link between India and Tibet.

August 26, 1987

ভূমিকা

দলাই লামা

থেকচেন চোয়েলিং
ম্যাকলিয়ডগঞ্জ ১৭৬ ২১৯
কাঙরা জিলা
হিমাচল প্রদেশ

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের সুগভীর জ্ঞান গরিমার জন্য এবং বুদ্ধের শিক্ষানীতি চর্চার পথ নিঃসংশয়ে অনুসরণ করে চলতে আমাদের দীক্ষিত করার জন্য তিব্বতীয় বৌদ্ধগণ তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে থাকেন।

অতীশ যে সময়ে তিব্বতে আমন্ত্রিত হন তখন যে ধর্মব্যবস্থার রাজা লাং ধর্মের রাজত্বকালে অবনতি ঘটে তা সবেমাত্র আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করেছে। তাঁর বিচক্ষণতার ফলে তিনি তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের শোধনের কাজে বিপুল অবদান রাখতে এবং ঐ ধর্মমতের ব্যাপক প্রসারতায় সহায়তা করতে পেরেছিলেন।

অতীশ সম্পর্কে শ্রীদেবেশ দাশের বইটিকে আমি স্বাগত জানাই। সেই মহান্ আচার্য সম্পর্কে লেখা অনেক গ্রন্থাদির মধ্যে এইটিও হবে আর একটি সংযোজন। আমি সুনিশ্চিত যে, ভারত ও তিব্বতের মধ্যে বহুকালের প্রাচীন সুসম্পর্কের সচেতনতা প্রসারের ক্ষেত্রে এই বই সহায়তা করবে।

অগাস্ট ২৬, ১৯৮৭ — দলাই লামা

রাজার কুমার পক্ষিরাজে

॥ ১ ॥

সে এক রাজপুত্তুর—যায় দেশে বিদেশে। তেপান্তরে। সাত সমুদ্দুর আর তের নদী মাঝখানে থাকলে কি হবে? পথের ঝড়-ঝাপটা, অজানা দেশের আপদ-বিপদ, এমনকি রাক্ষস-খোক্ষসের মত শত্তুরের দল কিছুতেই রাজপুত্তুরকে টলাতে পারে না।

সে-যে রাজার কুমার।

যে দেশে সে যাবে, সেখানে ঘুমিয়ে আছে রূপকথার মতোই এক রহস্যময়ী রাজকন্যে। কত যুগ ধরে তার প্রাণ-ভোমরা নিথর হয়ে আছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

সে-রাজকন্যে হল—একটা দেশ। একটা দেশকে কোন রাজকন্যার সঙ্গে তুলনা কোন রূপকথা করেনি। কিন্তু এই কাহিনী যে সেরা রূপকথা।

সেই রাজকন্যাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সোনার জীয়ন কাঠি ছুঁইয়ে, অনাচারে ভরা, অন্যায়ে ঘেরা সেই দেশটির—সেই ঘুমন্ত রাজকন্যাটির নতুন ক'রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

অনেক বাধা আসবে, বিপত্তি হবে। মোহিনী মায়া দিয়ে ডাইনি বুড়ি ভোলাতে চাইবে রাজপুত্তুরকে। কিন্তু পারবে না।

কারণ, রাজপুত্র জানে যে, সে চলেছে মহান্ একটা মন্ত্র নিয়ে। মহান্ একটা ব্রত পালনের সঙ্কল্প নিয়ে। পরের মঙ্গলের জন্য তার

নিজের জীবন সে সঁপে দিয়েছে। ভগবানের আশীর্বাদ আছে তাঁর মাথার ওপর। সে জয়ী হবেই হবে। সেই দেশ — সেই রাজকন্যে জেগে উঠবে নতুন জীবনে। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে। পৃথিবী হবে সুখী, স্বচ্ছন্দ, শান্তিময়।

সেই হাজার বছর আগেকার রূপকথার মতো কাহিনীর নায়ক এবং সেই রাজপুত্তুর ছিলেন এক অসামান্য বাঙালী।

আর রাজকন্যেটি ছিলেন — হিমালয়ের মেয়ে, হিমালয়ের মাথার মণি। তখন নাম ছিল হিমবন্ত — এখন্ যাকে বলি তিব্বত।

॥ ২ ॥

রূপকথার মতো এই গল্পেও রাজপুত্র, রাজকন্যা, ঢাল-তলোয়ারের ঝন-ঝনানি — সবই আছে। এমন কি রাজাকে কারাগারে বন্দী করে রাখা, তার জন্য মুক্তিপণ দাবী করা — সবই ঘটেছিল।

রাক্ষস-খোক্ষসের মতো শত্রুর দল, পাহাড়ী ডাকাতের দল, ডাকিনী যোগিনী, কত কিছু এসেছিল ঘিরে। কত অলৌকিক ঘটনা, আশ্চর্য পরিবেশ হয়েছিল সৃষ্টি।

কিন্তু আরো যা আছে, তা এই রাজপুত্রের কাহিনীকে পৃথিবীতে অতুলনীয় করে রেখেছে।

সেই কাহিনী তুলে ধরা দরকার। আমরা বাঙালীরা, ভারতবাসীরা যে কত উঁচুতে উঠতে পারি, তার পরিচয় আছে এই কাহিনীতে। যার বিবরণ রূপকথায় ভরা হলেও সত্য দিয়ে ঘেরা।

বাঙালী রাজপুত্রটি কত কষ্ট স্বীকার করলেন, বিদেশে বিভূঁয়ে চিরকালের জন্য যেন স্বেচ্ছায় নির্বাসনেই চলে গেলেন তিনি। ঐ দেশে গেলে তাঁর নিজের আয়ু কমে যাবে, এমন সাবধান বাণী শুনেও মহান্ উদ্দেশ্যে তিনি রওনা হয়েছিলেন। কোন্ রূপকথাতে রাজপুত্র এমন দুঃসাহসিক কাজ করেছে? কোন রাজপুত্র, আদ্যিকালে বা এইকালেই এমন স্বার্থত্যাগ করেছে?

আর বিদেশে অভিযান ? রহস্য আর রোমাঞ্চের দেশে মহান্ ব্রত নিয়ে চলে যাওয়া ? অজানা পথে অচেনা লোকের মধ্যে একা এগিয়ে যাওয়া ? তখনকার দিনে ভাবা যেত না।

যারা সঙ্গে চলল, তারা কেউ নিজের দেশের লোক নয়, নিজের জাতির লোক ত নয়ই। শুধু ধর্মের টানে, ভগবানে ভরসা ক'রে এমন দেশে যাওয়া — যা এখনো পর্যন্ত একরকম নিষিদ্ধ দেশ — আজ পর্যন্ত, সে-দেশে সহজে কেউ ঢুকতে পারে না। তেমন এক নির্বান্ধব দেশে কোন দুঃসাহসে গিয়েছিল সেই রাজপুত্রটি ?

সুমেরু কুমেরু দেশে তুমি যে-কোনও সময় যেতে পার, যদি মনে থাকে সাহস, দেহে শক্তি অর্থাৎ অল্প বয়স, সুস্বাস্থ্য আর থাকে বৈজ্ঞানিক সাহায্য সাজ-সরঞ্জাম।

কিন্তু হাজার বছর আগের অজানা জঙ্গলে ভরা, ডাকাতে ভরা, পাহাড়ে ঘেরা বরফে ঢাকা দেশে যাওয়া ? তন্ত্রমন্ত্রের দেশ তিব্বতে ? আর ষাট বছর বয়সে ?

আমাদের এই রূপকথা তেমনই এক রাজপুত্রকে নিয়ে।

এমনি রাজার কুমার নন — তিনি হয়েছেন পণ্ডিত, হয়েছেন সন্ন্যাসী, হয়েছেন সবচেয়ে বড় শিক্ষাদাতা — উপাধ্যায়।

আজকের যুগে আমরা পরীক্ষা পাস ক'রে, নয় তো বিশাল বিশাল বই লিখে অনেক উপাধি পাই, মহামহোপাধ্যায় হয়ে যেতেও পারি। হাজার বছর আগে কিন্তু উপাধি পাওয়া সহজ ছিল না। বড় বড় পণ্ডিতেরা, জ্ঞানীগুণীজনেরা নিজেরা উপাধি দিতেন। তার জন্য কঠিন পরীক্ষা দিয়ে যোগ্য হতে হত। মর্যাদা অর্জন করতে হত।

তিব্বতের তেমনই এক বিরাট পণ্ডিত ছিলেন লামা তারানাথ। তিনি একখানি পুঁথিতে লিখেছেন যে, তখনকার বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বড় আচার্যকে 'পাহারাদার' বলে মনে করা হত। বিশ্ববিদ্যালয়ে সব বিদ্যা সব জ্ঞান যে পাকাপাকিভাবে বিশুদ্ধ আছে আর তা সঠিকভাবে বিতরণ করা হচ্ছে, সে বিষয়ে তাঁকেই সব প্রহরা দিতে

হত। একের পর এক ছ'জন তেমন পাহারাদারের পর, আর তেমন সুযোগ্য আচার্য বেশ কিছুদিন প্রহরার জন্য পাওয়া যায় নি। তার পরে সেখানে গিয়েছিলেন উপাধ্যায় অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

ঐ বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি চলে যাওয়ার পরেও আবার সাত বছর কোন যোগ্য প্রধান আচার্য বা প্রহরার লোক পাওয়া যায়নি।

এই ছিলেন আমাদের গুরু দীপঙ্কর। তিন-তিনবার চেষ্টা-যত্ন করেই তাঁকে তিব্বত-রাজ নিজের দেশে ধর্মসংস্কার আর সুনীতি প্রচারের জন্য আনাতে পেরেছিলেন।

তৃতীয়বার চেষ্টার সময় বিক্রমশিলায় সব শ্রেণী মিলে আট হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মহাসম্মেলন হয়েছিল। নাগচো নামে এক তিব্বতী পণ্ডিত-রাজদূত দীপঙ্করকে তিব্বতে নিয়ে যাবার জন্য আমন্ত্রণ করতে আর রাজী করাতে এসেছিলেন। তাঁকে বলা হয়েছিল যে ঐ ভিড়ে যাঁকে সবচেয়ে উজ্জ্বল, সম্মানের যোগ্য, মহিমায় মণ্ডিত দেখবে — জেনো, তিনিই হচ্ছেন দীপঙ্কর।

তাঁর চারিপাশে বিরাট বিরাট পণ্ডিতেরা ছিলেন। তাঁরা ছিলেন আকাশের তারার মতো। আর তিনি যেন সেখানে পূর্ণচন্দ্র।

॥ ৩ ॥

এবার রাজপুত্রের প্রথম জীবন আর বাড়িঘরের খবর নেওয়া যাক।

আজকের দিনে 'বাংলা' বললে যে অঞ্চল বোঝায়, চিরকাল যে শুধু সেটুকুই 'বাংলা দেশ' নামে পরিচিত ছিল, তা নয়। আর 'বাংলা' নামটাও এমনভাবে বলা হত না। কথাটা ছিল 'বঙ্গাল'। তখনকার দিনে ত আর ভূগোলের মানচিত্র ছিল না। বাঁধাবাঁধি সীমান্ত টেনে দেওয়া হত না। একটা বড় লড়াইয়ের ফলে কিংবা বড় রাজত্ব তৈরি হয়ে গেলে দেশের নাম বা সীমানা বদলে যেতে পারত। শুধু কোন নদী বা বড় শহর বা জঙ্গল, এসব দিয়ে একটা সীমানা মোটামুটি ধরে

নেওয়া হত। তা, সেই নদীগুলি সরে যায়, শহরগুলি মুছে যায়। আর জঙ্গল তো মানুষ নিজের দরকারে কেটে সাফ করে দেয়। অন্য দিকে, অযত্নে ফেলে রাখা প্রান্তর আগাছার আক্রমণে আপনা থেকে নতুন জঙ্গল হয়ে যায়। এত মানুষের ভিড় ত সে যুগে হয় নি।

এযুগে পাটনা বেড়াতে গেলে লোকে নালন্দা নামে যে জায়গাটাও অবশ্যই দেখতে যায়, সেটি ছিল এই 'বঙ্গাল' দেশেরই কাছে। মাটি খুঁড়ে হাজার বছর আগেকার সেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট শহরটি চোখের সামনে আজ হাজির করা হয়েছে। একসময়ে সেখানে হাজার হাজার ছাত্র আর পণ্ডিত বাস করতেন। পড়াশোনা হত পুরোদমে।

সমুদ্র পেরিয়ে, না হয় হিমালয় ডিঙিয়ে, চীন মঙ্গোলিয়া মালয় সুমাত্রা যবদ্বীপ প্রভৃতি জায়গা থেকে সেখানে বড় বড় পণ্ডিতেরা আসতেন। তাঁরা আসতেন নালন্দার পণ্ডিতদের কাছে আরো বেশি বিদ্যা লাভ করবার জন্য, আরো সঠিকভাবে ধর্ম শিক্ষা করবার জন্য। প্রাচীন পুঁথিপত্র নকল ক'রে নিজের দেশে নিয়ে যাবার জন্য। নিজের ভাষায় সেগুলি অনুবাদ ক'রে দেশের লোকের জ্ঞান বাড়াবার জন্য।

আর বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলাবাস্তুর মতো, তাঁর দিব্য জ্ঞান প্রাপ্তির স্থান বোধগয়ার মতো, এই যে শিক্ষাদানের স্থান নালন্দা, সেটিও ছিল সে যুগের এক মহা পবিত্র তীর্থ।

ভুললে চলবে না, সব ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের লোকই সংখ্যায় সব চেয়ে বেশি। এই নালন্দায় বৌদ্ধ ধর্মের যে পন্থা চলিত ছিল, তার নাম বজ্রযান। বুদ্ধগয়ার নাম ছিল বজ্রাসন। আর নালন্দার পূর্বদিকে ছিল 'বঙ্গাল' নামে সেই একটি মহান্ দেশ। সেই দেশের রাজা কল্যাণশ্রী, রাণী পদ্মপ্রভা।

রাজা কল্যাণশ্রীর ছেলের নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। খুব ছোট বয়সেই রাজা তাঁকে জেতারি নামে এক সন্ন্যাসী অবধূতের কাছে লেখাপড়া শিখতে পাঠালেন। জেতারি তাঁকে পাঁচটা শাস্ত্র পড়ালেন। আর

সেগুলি ছিল এমন সব বিষয় যা ধর্ম আর দর্শন পড়ার জন্য শিষ্যকে তৈরি করে দেবে।

তিনি রাজপুত্রকে আরো একটি শিক্ষা দিলেন। —'দেখ বাবা, তুমি রাজার ছেলে। বিক্রমপুরের গৌড়রাজ বংশের ছেলে। বাবার রাজ্য থেকে অনেক দূরে লেখাপড়া শেখবার জন্য চলে না গেলে তোমার মন থেকে অহংভাব যাবে না। অহং ভাব না গেলে প্রকৃত বিদ্যালাভ হয় না।'

এমন একটি উপদেশের দরকারও ছিল। ছাত্র যে জন্মেছিলেন এমন এক শহরে যেখানে দু'লক্ষ লোকের বাস। তখনকার হিসাবে সেটা ছিল বিরাট এক মহানগর। তার মাঝখানে রাজার রাজধানী। অঢেল ঐশ্বর্য, বড় বড় প্রাসাদ, জাঁকজমক, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পথঘাট। জমজমাট রাজপাট।

তার ঠিক মাঝখানে রাজপ্রাসাদ। নাম তার স্বর্ণধ্বজ।

একজন তিব্বতী ঐতিহাসিক লিখে গেছেন যে, স্বয়ং শাক্যমুনি চন্দ্রগর্ভকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে ঘর সংসার ছেড়ে দীক্ষিত সন্ন্যাসী হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাহলে ধর্মের ভবিষ্যৎ সুগম হবে।

কাজেই, সব আরাম আর বিলাস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন রাজার কুমার। দীক্ষা নেওয়ার পর নাম হল দীপঙ্কর।

রাজপুত্রের অভিযান শুরু হল ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর রূপকথার খোঁজে নয়। নতুন রাজত্ব পত্তনের জন্য নয়।

তিনি বিদ্যা লাভ করবেন। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে নানারকম ভাগ ছিল, নানা মত ছিল। প্রধান ছিল হীনযান আর মহাযান। তিনি এই দুটি মতেরই ত্রিপিটক গ্রন্থ গভীরভাবে চর্চা করলেন। মাধ্যমিক আর যোগাচার্য নামে আরো দুটি বিদ্যাও আয়ত্ত করলেন। তন্ত্রশাস্ত্রের চার-চারটি শাখায় পণ্ডিত হলেন। অর্থাৎ তখনকার ভাষায় তিনি হলেন 'তির্থিক'।

'তির্থিক' কথাটা কেমন কেমন মনে হচ্ছে, তাই না? কিন্তু সে-যুগে

তীর্থ আর ধর্ম যে পাশাপাশি থাকত। একটি ছেড়ে অন্য হত না।

আবার তির্থিকরা তার্কিকও হতেন। তখনকার যুগে কোন্ ধর্ম বড়, তার বিচার প্রায়ই হত তর্ক দিয়ে, তরোয়াল দিয়ে নয়।

ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর অলৌকিক রূপকথার চেয়ে অনেক বেশি অদ্ভুত একটা জিনিস আছে আমাদের এই রাজকুমার-কাহিনীতে। তা হচ্ছে — তৃতীয় নয়ন। জ্ঞানের দৃষ্টি। তৃতীয় চোখ নয়। তিব্বতের কোন কোন সাধুসন্ত নাকি তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চা ক'রে তৃতীয় নয়ন অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি লাভ করতেন। রাজপুত্রের সেই তৃতীয় নয়ন যেন খুলে গেল ধর্মের দিকে — সংসার এড়িয়ে, রাজপাটের আরাম ছাড়িয়ে।

তিনি নীতি, ধ্যান আর ধর্ম, এই ত্রিশিক্ষা নিলেন একটি বৌদ্ধ বিহারে। এমনি বিদ্যা আর মনের সম্পদ অর্জন করলেন যে, মাত্র উনিশ বছর বয়সে ওদন্তপুরী মহাবিদ্যালয়ের আচার্য মহাসাংঘিক শীল রক্ষিত তাঁকে সমস্ত গোপন মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। আর নাম দিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে তিনি ভিক্ষুদের মধ্যে সবার ওপরের শ্রেণীতে উঠে গেলেন। আর বোধিসত্ত্বের মন্ত্র লাভ করলেন। মগধের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ দার্শনিকদের কাছে পাঠ নিয়ে তিনি জ্ঞানের রাজা হলেন।

এই ভাবে গড়ে উঠল এই রাজপুত্রের মন-জাগানো প্রাণ-বাঁচানোর সোনার কাঠি।

রাজপুত্র জানতেন যে, সুবর্ণ দ্বীপের মহাসাংঘিক হচ্ছেন আচার্য চন্দ্রকীর্তি। সুবর্ণ দ্বীপ ছিল ব্রহ্মদেশের তখনকার নাম এবং প্রাচ্যে বৌদ্ধধর্মের সবচেয়ে বড় পীঠস্থান ছিল ব্রহ্মদেশ। বৌদ্ধধর্মের গূঢ় রহস্যের চাবিকাঠিটি তখন ছিল শুধু সেই আচার্যের কাছে। তাই দীপঙ্কর বণিকদের জাহাজে চড়ে তাদেরই সঙ্গে চললেন সমুদ্র পেরিয়ে। মাসের পর মাস কেটে গেল সমুদ্রে। ঝড়ের পর ঝড় আর দুরন্ত ঘূর্ণি রাক্ষস-খোক্কসদের মতো তাকে গ্রাস করতে এল বারে বার। বঙ্গোপসাগর

চিরকালই অশান্ত, বিপদে ভরা। পালতোলা নৌকো প্রায়ই হয়ে যায় ডুবু ডুবু।

পঞ্চাশ বছর আগে এদেশ থেকে ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে বিদ্যাশিক্ষা করতে যেতাম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজে মাত্র কুড়ি দিনের মধ্যে। আজকাল আমরা আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে যাই মাত্র কুড়ি ঘণ্টায়। তুলনা করে ভাবতে হয় সে যুগে দীপঙ্কর কি অসাধ্য সাধন করেছিলেন! আর কত বিপদ মাথায় করে বিদ্যা অর্জনের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন!

কিন্তু রাখে বুদ্ধ, মারে কে?

বারো বছর পরে তিনি সেখান থেকে আরো দূরে চললেন। এবার লঙ্কা দ্বীপে। তখন নাম ছিল তাম্রদ্বীপ। রামায়ণের স্বর্ণলঙ্কা। সেখানে যদি কোন নতুন জ্ঞানের সোনার খনি পাওয়া যায়।

সেখান থেকে আরো জঙ্গলে ভরা দ্বীপ ঘুরে তিনি মগধে ফিরে এলেন। মগধে তখন সবচেয়ে বেশিসংখ্যক বৌদ্ধ পণ্ডিতের আশ্রম। রাজা ন্যায়পাল তাঁকে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ হতে অনুরোধ করলেন। তাছাড়া নালন্দায় থাকার সময়ে তিনি অন্যান্য ধর্মের তির্থিক অর্থাৎ ধর্মাচারী তার্কিকদের ধর্ম আলোচনায় হারিয়ে দিলেন।

কনৌজের রাজা সে-সময়ে বাংলার রাজা ন্যায়পালের রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। দীপঙ্করের সম্মান এত বেশি ছিল, দুই রাজাই তাঁর পরামর্শ নিয়ে তাঁরই শর্ত মেনে নিয়ে যুদ্ধ মিটিয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন। সে-যুগে বঙ্গাল বলতে যে-বিরাট দেশ বোঝাত, মগধ ছিল তারই অংশ।

এমন মহাপুরুষের কথা আমরা খুব কমই জানি, যাঁর কাছে পণ্ডিত ধার্মিক আর রাজা-মহারাজেরাও সমানভাবে মাথা নিচু ক'রে এসে দাঁড়ায়!

একবার তুলনা করে দেখতে লোভ হয়—পৃথিবীর ইতিহাসে কি এমনটি কোথাও ঘটেছে যেখানে দুজন রাজা যুদ্ধ করতে গিয়ে ধার্মিক লোকের পণ্ডিত লোকের কথা মেনে সন্ধি করেছেন, শান্তি স্থাপন

করেছেন ?

আমাদের ভারতবর্ষের শিক্ষাই এই।

॥ ৪ ॥

'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।'

শুধু ত রাজপুত্র নন, ধর্মগুরুও তিনি। এত অল্প বয়সে সাগর পেরিয়ে দেশ-দেশান্তর থেকে শাস্ত্র বিদ্যা লাভ ক'রে দীপঙ্কর হয়েছেন পণ্ডিত চূড়ামণি। তাই চাণক্য পণ্ডিতের লেখা শ্লোকের এই কথা কয়টি এমন পরিপূর্ণভাবে খুব কম মানুষের জীবনেই ফুটে উঠেছে।

প্রথমে রাজপুত্রের সাংসারিক জীবনের কথাই ধরা যাক্।

আশ্চর্যের কথা, তার কোন বিবরণ তাঁর নিজের দেশে নিজের ভাষায় লেখা বইতে বা ইতিহাসের পুঁথির মধ্যে বিশেষ পাই না। তার জন্যে আমাদের যেতে হবে সেই রূপকথার রাজকন্যার দেশে, অর্থাৎ নিষিদ্ধ দেশ তিব্বতে।

আরও আশ্চর্যের কথা যে, সে-সব কিছুর বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ আর নথিপত্র আমাদের নজরে প্রথম এল তাঁর জন্মের নয় শ' বছর পরে। অর্থাৎ মাত্র এক শ' বছর আগে। সে-সব পেয়েছি আমরা তিব্বত আর মঙ্গোলিয়ার ভাষায় লেখা পুঁথিতে। সেগুলি মিলিয়ে দেখতে হয়েছে চীনাভাষায় অনুবাদ করা সংস্করণের সঙ্গে।

এর কারণটা শুনলে খুব আশ্চর্য ঠেকবে। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন সব আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে বারে বার।

এই ধরা যাক বৌদ্ধধর্মেরই কথা। ভারতবর্ষে তার উদয় হল, বিস্তার হল ব্যাপকভাবে। আলোড়িত হল আসমুদ্র হিমাচল। সেই বৌদ্ধ-ধর্মের দীপশিখা নিয়ে আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা মধ্যযুগ পর্যন্ত দেশে দেশে আলো জ্বালালেন। মধ্য এশিয়ায় যে-সব দেশ এখন রাশিয়ার মধ্যে আছে, সেখান থেকে চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল অর্থাৎ শ্রীলঙ্কা দ্বীপ, শ্যাম, মালয়, এমনিভাবে গোটা দ্বীপময় ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-

ধর্মের জয়গান ছড়িয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষ হয়েছিলেন বৌদ্ধ।

অথচ সেই বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে প্রায় লোপ পেয়ে গিয়েছিল—দেড় হাজার বছর ধরে বিরাজ করার পরেও। অত বিদ্যা, অত ত্যাগ, রাজসম্মান কিছুই তাকে রক্ষা করতে পারল না।

শুধু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত কেন, তারও উত্তরে, তারও পশ্চিমে হিমালয় কারাকোরাম হিন্দুকুশ শৈলমালার ওপারে ছড়িয়ে পড়েছিল বুদ্ধের বাণী, বৌদ্ধধর্মের নানা প্রথা, নানা দর্শন শাস্ত্র। হাজার হাজার মঠ, সংঘারাম, বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল সর্বত্র। অশোক, হর্ষবর্ধন, কণিষ্কের মতো মহান্ রাজারা সেগুলিকে তুলে ধরেন।

তবু হাজার দেড়েক বছরের মধ্যে সে-সব লোপ পেয়ে গেল। অনেকখানি নষ্ট হল বিদেশী আক্রমণের চাপে। কারণ, প্রায়ই অন্য ধর্ম—বিশেষ ক'রে নতুন ধর্ম এসে প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত ধর্মকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করে। এদিকে পুরনো হিন্দু বৈদিক ধর্মচর্চাও নতুন জীবন আর নতুন রূপ নিয়ে বহু বৌদ্ধকে সনাতন হিন্দুধর্মের দিকে আকৃষ্ট করল।

তাছাড়া সম্পত্তির লোভও ধর্মের কম অনিষ্ট করেনি। রাজারা মঠগুলিতে অনেক দান করতেন। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের ভরণপোষণের জন্য শুধু নয়—বিদ্যাচর্চার জন্য, সমুদ্র পেরিয়ে দেশ-বিদেশ থেকে আসা পণ্ডিতদের ধর্ম শিক্ষা দেবার জন্যও রাজারা সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করে দিতেন।

বিদেশী আক্রমণকারীরা সেজন্য মনে করত যে, ঐ সব মঠ বা ধর্ম-বিহারে অনেক ধনরত্ন লুকানো আছে। কাজেই, সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ির চেয়ে সন্ন্যাসীদের মঠ আর ধর্মবিহারগুলির ওপরেই বিদেশী লুঠেরা সৈন্যদের নজর থাকত অনেক বেশি।

তিব্বতী পুঁথিতে আছে যে, অতীশকে সেখানকার রাজা সাম্মানিক দক্ষিণা স্বরূপ যে বিপুল পরিমাণ সোনা অর্পণ করেছিলেন, তার সবটাই

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাচর্চা আর সন্ন্যাসীদের মঠ ও ধর্মবিহারগুলি সংস্কার সংরক্ষণের কাজে ব্যয় করা হয়েছিল।

হায়! আসল ধনরত্ন যে সোনাদানা নয়—তা হল মনের রত্নসামগ্রী, সে কথা বিদেশী লুঠেরা সৈন্যেরা আর তাদের রাজারা জানবে কেমন ক'রে? অন্যান্য দেশে ত রাজারাজড়ারা এসব পরমার্থিক দিকে সাধারণত মন দিতেন না।

অবশ্য পশ্চিম আর উত্তর ভারতবর্ষে অনেক হিন্দু মন্দিরে রাজ্যের ঐশ্বর্য জড়ো ক'রে উজাড় ক'রে দেওয়া হত দেবতার পায়ে।

গজনী এককালে বৌদ্ধধর্মের বড় কেন্দ্র ছিল। ক্রমে ক্রমে মুসলমানদের ইসলাম ধর্মের দেশ হয়ে গেল। গজনীর সুলতান মামুদ তের-তের বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন—শুধু অন্য ধর্মের মঠ-মন্দির ভেঙেচুরে ইসলাম ধর্মপ্রচারের পুণ্য কাজ করতে নয়—সারা হিন্দুস্থানের ভক্তদের আর রাজা-রাজড়াদের দান স্বরূপ সঞ্চিত বিপুল ধনরত্ন সম্পদের লোভেই। যেমন, সৌরাষ্ট্রের সোমনাথ মন্দির লুঠ ক'রে সুলতান মামুদ যা ধনরত্ন হীরে জহরত পেয়েছিলেন, তার বিপুল হিসাব তাঁর সময়কার ঐতিহাসিকেরা লিখে গেছেন। এইভাবে বিভিন্ন মুসলমান আর বৌদ্ধ তিব্বতী লেখকদের রচনা থেকেই জানা যায়—বৌদ্ধধর্ম কেমন করে লোপ পেয়ে গেল।

কিন্তু পূর্বভারতে বৌদ্ধ ধর্মবিহারগুলির সম্পদ ছিল অপার্থিব। তবু সেগুলি বিদেশী আক্রমণের কবল থেকে রক্ষা পায়নি। সাধারণ লোক, ধনী, বণিক, সামন্ত, রাজবংশের সবাই সেখানে দান করতেন। রাজারা ছিলেন সেগুলির পৃষ্ঠপোষক। অতএব লুঠেরাদের লক্ষ্য ছিল সেদিকেও।

এমনি ঘটনা ঘটেছিল সুদূর মিশরেও। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার পৃথিবীর মধ্যে হয়ে উঠেছিল নামকরা। সেই শহরটি যখন আরব-সৈন্যেরা জিতে নিল, তখন তারা ফাঁপরে পড়ল। রাশি রাশি বই। তার মানে জানা নেই, আর মানে খুঁজে বের করবার সময়ও নেই।

সৈন্যেরা অতশত ধার ধারে না। ওরা ঠিক ক'রে নিল যে ঐ সব বইতে যা আছে, তা যদি কোরানে থেকে থাকে, তাহলে ওগুলোর আর দরকার নেই। আর কোরানের বাইরের যদি কিছু থাকে, তাহলে সেগুলি থাকার দরকার নেই। অতএব ঝামেলা চুকিয়ে ফেল—দাও সব পুড়িয়ে।

পরে পণ্ডিতেরা হয়ত হাহাকার করেছিলেন যে, কত অমূল্য বিদ্যা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তেমনি, আমাদের দেশেও কত প্রাচীন শাস্ত্র সাহিত্য হয়ত এমনি করেই লোপ পেয়ে গেছে।

পূর্বভারতের একটি ধর্মবিহারেও এমনি কাণ্ডের কথা মুসলমান ঐতিহাসিকের লেখায় পাই। একটি ধর্মবিহার আক্রমণ ক'রে সৈন্যেরা এমন খুনখারাপি আর লুটপাট চালাল যে, সেখানকার গ্রন্থাগারে যেসব বই ছিল, সেগুলির অর্থ বা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য গোটা শহরেই একজনও 'নেড়া মাথা' অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষু পাওয়া গেল না। বৌদ্ধ-ধর্মের জীবনীশক্তি ছিল সেই ভিক্ষু মুণ্ডিতমস্তক পণ্ডিতেরা।

তাহলে সেই বইগুলির আর সেই জায়গায় যে বিদ্যাচর্চা হত, তার কি হল? আর সেই সারগর্ভ বিদ্যাচর্চার ওপর নির্ভর ক'রে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে ধর্মবিশ্বাস, তারই-বা কি হল?

॥ ৫ ॥

যে-জগতের কথা এখানে বলছি, সেখানে কিন্তু রাজকন্যারা সকলেই রূপ-কথার রাজকন্যাদের মতো মোহিনী মায়ায় আচ্ছন্ন ছিলেন না। বরং তাঁদের অনেকেই অশিক্ষা কুসংস্কার এসব দূর ক'রে মানুষের মন বড় ক'রে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রাচ্যের অনেক নারী একাজে এগিয়ে ছিলেন।

তাঁরা যেসব দেশ থেকে এসে রাজরানী হয়ে ছিলেন, সে-দেশগুলিতে পবিত্র ধর্মের আলো জ্বলেছিল। আর সে-আলো ভারতবর্ষ থেকেই আনা আলো।

অবশ্য প্রায় তের-চোদ্দ শ' বছর আগে আমাদের দেশেও হিন্দু আর বৌদ্ধ দুটি ধর্মেই সাধারণভাবে অনেক অনাচার ঢুকেছিল। আর সাধারণ লোকেরা সেইগুলিকেই ধর্ম আচরণ বলে মনে করে নিয়েছিল। তন্ত্রচর্চার নামে এমন সব দেব-দেবীর ব্যাখ্যা, প্রক্রিয়া আর পূজা অর্চনা আরম্ভ হল, যা সে-যুগেও সাধুব্যক্তিরা ঠিক বলে মনে করতেন না। তাঁদের অগ্রাহ্য ক'রে উপনিষদের বাণী আর বুদ্ধদেবের শিক্ষা যেন ছাইচাপা পড়ে গেল।

অথচ আশ্চর্যের কথা—সে-সব ভুল প্রক্রিয়াগুলি অসাধারণ দৈব ক্ষমতা বা সিদ্ধি ফললাভ এনে দেয়, এই মনে ক'রেই সাধারণ লোকেরা বেশ মেনে নিয়েছিল। শিক্ষিত পদস্থ লোকেরাও সেই যুগ-প্রভাবে বশীভূত হয়ে ছিলেন।

একটা কথা আছে না?—ভয় থেকে ভক্তি। তাই বলা হত, প্রেতাত্মা ডাকিনী যোগিনী যক্ষ রাক্ষস মার, এরাই নাকি মানুষকে চালিয়ে বেড়ায়। এরাই ভাগ্যের হেরফের করে দিতে পারে।

যদি এইরকম ভয় ধরানোর মত ধারণা মানুষকে শাসনে রাখতে পারে, অবশ ক'রে তোলে, তাহলে মূর্খ মানুষেরা তাদেরই ভগবান ভেবে পূজা করবে। মনে করবে, ঐ সব ডাকিনী যোগিনীদের ক্ষমতা বুঝি অসীম।

অনেক তান্ত্রিক সাধু সন্ন্যাসী সাধারণ মানুষকে এইসব বুঝিয়ে ধর্মের আচার-আচরণে নোংরামি এনে দিয়েছিল—এনেছিল অনেক অনাচার, অসংখ্য কুসংস্কার, অগণিত বিশ্রী প্রক্রিয়া।

হাজার বছর আগে সারা উত্তর ভারতে, এমনকি বাংলায় নেপালে কাশ্মীরে অনেক অনাচার চলত। ভগবান বুদ্ধের পরিচ্ছন্ন উদার পরোপকারী ধর্মচর্চাও এই আওতার বাইরে থাকতে পারেনি।

তিব্বতে বন-পা নামে এক ধর্মচচা প্রচলিত ছিল। এই ধর্মবিশ্বাসের ফলে, বন-পা ধর্মের লোকেরা যাদুবিদ্যায় ওস্তাদ ছিল—ভূতপ্রেত আর পাতালের কাল্পনিক রক্তমাংসখাদক উপদেবতাদের খুশি রাখবার জন্য হরেকরকম গুপ্ত প্রক্রিয়া অভ্যাস করত। মর্ত্যের অশরীরী আত্মাদের

আর স্বর্গের দেবতাদেরও পূজা করত। ভূতের ওঝারাই ছিল ঐ ধর্মচর্চার পুরোহিত। কাজেই হরেক রকম কুসংস্কার ওদের সরল ধর্মবিশ্বাসকে ছাইচাপার মতো ঢেকে রেখেছিল।

প্রায় তের শ' বছর আগে তিব্বতে খুব বিক্রমশালী এক রাজা ছিলেন। নাম স্রং-সান্‌-গাম্পো। তিনি দুটি বিয়ে করেছিলেন। একটি নেপালের রাজকন্যা, আরেকটি চীনের রাজকন্যা। দুজনেই ধর্মপ্রাণা, বৌদ্ধ।

নেপালের রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চেয়ে তিনি নেপালরাজ অংশুবর্মণকে চিঠি লিখলেন—আমি তিব্বতরাজ—ধর্মের যে দশটি পুণ্য বিধি আছে, তা আমি মেনে চলি না। কিন্তু আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে আপনার কন্যাদান করেন আর আমি ধর্মপালন করি এই চান, তাহলে পাঁচ হাজার গুণ ধর্মমন্দির তৈরি করব।

নেপালের রাজা রাজী হলেন। ভারতবর্ষকে তিব্বতে বলা হত আর্যভূমি। সেই দেশের বিদ্যা আর সভ্যতার খবর রাজা পেয়েছিলেন। তাঁর নজর তাই এতদূর ছড়িয়ে পড়ল।

রাজকন্যার সঙ্গে অর্ধেক রাজত্ব পাওয়ার কথা রূপকথায় আছে। কিন্তু রাজকন্যার সঙ্গে একটি পবিত্র উন্নত জীবনের দিশা নিজে থেকে নেওয়া,—এটা একটা নতুন রূপকথা। অথচ সত্যি ঘটনা।

ধর্মের সঙ্গে এল শিক্ষা, সভ্যতা আর অক্ষরলিপি। এর আগে তিব্বতে কোন লিখিত ভাষা ছিল না। কাজেই লোকেরা লিখতে বা পড়তে জানত না। রাজা তাঁর মন্ত্রী থম-মি সম্ভোটকে বিশেষ ক'রে এই অভাব দূর করবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। মন্ত্রী লিপি দত্ত নামে এক ব্রাহ্মণের কাছে সংস্কৃত ভাষা ও অক্ষর শিক্ষা করলেন। তার পরে গেলেন নালন্দাতে। সেখানে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করলেন।

সেই সময়ে চীন থেকে শিক্ষার্থী পরিব্রাজক হুয়েন সাং-ও নালন্দায় এসেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, ভারতে অগণিত সংঘারাম আছে।

কিন্তু গৌরবে আর সম্পদে নালন্দাই সবচেয়ে বড়। এখানে মঠে পুরোহিত পণ্ডিত আর ছাত্র সংখ্যায় প্রায় সর্বদাই দশ হাজারের ওপর থাকে। তখনকার জনসংখ্যার হিসাবে সেটা এক বিরাট ব্যাপার।

তারও এক শ'বছর পরে নালন্দা আর বঙ্গদেশের সঙ্গে তিব্বতের আরো বেশি সম্বন্ধ সৃষ্টি হল। রাজা থ্রি-সং-দু-সান্ বুঝেছিলেন যে, বন-পা নামে যে ধর্মপ্রথা তিব্বতের সাধারণ মানুষদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তা খুব উন্নত নীতি অনুসরণ করে না। তিনি গৌড়ের পণ্ডিত শান্ত রক্ষিতকে আমন্ত্রণ করলেন।

ইনি তখন নালন্দার ধর্মবিহারের সব চেয়ে বড় পণ্ডিত আর মগধরাজের গুরু ছিলেন। কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠ পদ আর প্রতিষ্ঠা ছেড়ে তিনি অনেক কষ্ট ত্যাগ স্বীকার করে তিব্বতে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই তিব্বতবাসীরা প্রচলিত ধর্মচর্চা 'বন-পা' পরিত্যাগ ক'রে প্রকৃত শুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হল। তাঁকে নাম দেওয়া হল আচার্য বোধিসত্ত্ব। তাঁরই এক তিব্বতী শিষ্য পরে প্রথম লামা হয়েছিলেন।

'লামা' কথাটির অর্থ হচ্ছে গুরুজন। মঠের প্রধান বা সবচেয়ে সেরা সন্ন্যাসীকে লামা বলা হত।

গৌড়ের সন্তান শান্তরক্ষিতের সম্বন্ধী গুরু পদ্মসম্ভব এই 'লামা' প্রথাটি প্রথম প্রবর্তন করেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন স্বনামধন্য তান্ত্রিক সাধক। তাঁর দেশের নামটিও ছিল বড় আকর্ষণীয় — 'উদ্যান'।

আগেই বলেছি যে, শ' দুই বছর পরে তাঁরই দেশ গজনী থেকে মুসলমান আক্রমণকারী লুঠেরা সুলতান মাহমুদ তের-তের বার ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করতে এসেছিল। অথচ মাহমুদের মাত্র দু শ' বছর আগের ঐ বৌদ্ধ দেশের চেহারা আর চরিত্র ছিল একেবারে অন্যরকম।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন 'উদ্যান' নামে দেশটিকে ভারতের উত্তর অংশ বলে লিখেছিলেন। নালন্দাকে বৌদ্ধধর্মের 'অক্স্‌ফোর্ড'



লামা শ্রদ্ধাগ্রহণ করছেন

বলা হত। অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হল পাশ্চাত্য দেশে সব সেরা শিক্ষাচর্চা কেন্দ্র। কারণ সবচেয়ে বড় পণ্ডিতেরা সেখানে পড়াতে আসতেন — সেখানে সবচেয়ে ভাল ছাত্ররাই ভর্তি হতে পারত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান আচার্য হয়েছিলেন পদ্মসম্ভব। তিনিও রাজার আমন্ত্রণে তিববতে গিয়েছিলেন।

শান্তরক্ষিত বৌদ্ধধর্মের নীতি আর নিয়মগুলির সঠিক ব্যবস্থা করার ভার পেলেন। পদ্মসম্ভব পেলেন বৌদ্ধ আচার-বিচারের তান্ত্রিক শাখার দায়িত্ব।

এখানে তন্ত্রচর্চার, বিশেষ ক'রে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের তন্ত্রচর্চার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা যাক।

ইতালিয়ান পর্যটক মার্কো পোলো অবশ্য অনেক চটকদার কথা রঙ চড়িয়ে তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে লিখেছিলেন। তবুও তা থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, তন্ত্রমন্ত্র দিয়ে 'গুণ' ক'রে অর্থাৎ বশ ক'রে ফেলার বিদ্যাচর্চায় উদ্যান-দেশ আর কাশ্মীরের লোকেরা বিশেষ পারদর্শী ছিল। তারা নাকি ভূতপ্রেত নামাতে পারত আর তাদের খেলনাগুলিকে দিয়ে কথা বলাতেও পারত। যাদুবিদ্যার বলে তারা আবহাওয়া বদলিয়ে দিতে পারত— এমনকি, অন্ধকার সৃষ্টি করতেও পারত।

মার্কো পোলো লিখেছিলেন যে, এসব স্বচক্ষে যে না দেখেছে, সে বিশ্বাসই করতে পারবে না। তাঁর মতে, এই হচ্ছে সেই দেশ— যেখান থেকে পুতুল পুজো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

চীনা ধার্মিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং-ও লিখেছিলেন যে, ঐ দেশের লোকেদের 'গুণ' ক'রে ফেলার দক্ষতা আছে। যাদুমন্ত্র ব্যবহার করাটা তাদের কাছে ছিল একটা দস্তুরমতো শেখবার জিনিস। অতি জনপ্রিয় মর্যাদাসম্পন্ন বিশেষ দক্ষশিল্পীসুলভ পেশা যাকে বলে।

সেই দেশ ভারতবর্ষের পণ্ডিত পদ্মসম্ভব নালন্দা থেকে তিব্বতে এসেই সেখানকার সেইসব বশীকরণপটু শয়তানদের হারিয়ে দিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্রের মতো তাঁরও নাকি বজ্র ছিল। তাই দিয়ে তিনি শয়তানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। আর ক্ষমতাও নষ্ট ক'রে দিতেন। তিনি গোঁড়া তান্ত্রিক মতে শিক্ষা দিতেন আর নিজের আদি দেশের মায়া যাদুমন্ত্র এসবও নিজের কাজে লাগাতেন।

এমন সময় চীন থেকে একজন বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারক এসে হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গে তর্কে এই দুই পণ্ডিত এঁটে উঠলেন না। এই ছিল সেকালে আমাদের দেশের রীতি। আর আমাদের ধর্ম আর মতের প্রভাব যে সব দেশে গিয়েছিল, সে সব দেশেও ছিল এই বিশেষত্ব। ধর্মের লড়াই হত শাস্ত্র বিষয়ে তর্ক দিয়ে। তলোয়ার দিয়ে নয়। ব্যাখ্যা দিয়ে। বর্শা বল্লম দিয়ে নয়। এটা পৃথিবীর ইতিহাসে একটা বিচিত্র ব্যাপার।

সেই তর্কযুদ্ধে হেরে গিয়ে ভারতবর্ষের পণ্ডিতেরা নিবেদন করলেন যে, মগধে আরও বড় একজন আচার্য আছেন — নাম তাঁর কমলশীল। তাঁকে এই ধর্মযুদ্ধের জন্য আনানো হোক। বিরাট তিব্বত দরবারে চীনের প্রচারক পণ্ডিতকে ধর্মব্যাখ্যায় হারিয়ে দিলেন। রাজা তাঁকেই তখন সে-যুগের তিব্বতের আধিভৌতিক বৌদ্ধধর্মের গুরু হিসাবে বরণ ক'রে নিলেন।

এই সব কাহিনীর পটভূমিতে আমাদের কাহিনীর রাজপুত্র দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা সহজ হবে। আরও এক শ' বছর পরে সেই নালন্দার ধর্মবিহারে, সেই বঙ্গাল দেশের রাজধানী মগধে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান পণ্ডিত শিরোমণি হয়েছিলেন। বাঙালী পাল বংশ তখন মগধে রাজত্ব করছেন। রাজা মহীপাল তাঁকে বজ্রাসন (আজকের বুদ্ধগয়া) থেকে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে এলেন।

আমরা দিদিমা ঠাকুমার কাছে সুয়োরাণী আর দুয়োরাণীর গল্প শুনেছি—অনেকে রূপকথার গল্পেও তা পড়েছি। এই দুই রাণীর মধ্যে হয়েছে ঝগড়া, হিংসা, ক্ষমতার লড়াই—এমনি কত কিছু। মোট কথা, সংসারে অশান্তি আর রাজা বেচারার প্রাণান্ত! আর দুয়োরাণীর দুঃখের সীমা নেই।

মোটামুটি এই হল সুয়োরাণী দুয়োরাণীর গল্পের ছক।

এই রূপকথার মতো মন-ভরানো কিন্তু ইতিহাসের সত্য কাহিনীতে চমকপ্রদ দুই রাণীর গল্পও আছে। কিন্তু তা একটু অন্য ধাঁচের ব্যাপার। মহাপুরুষদের জীবনকাহিনী যে অন্যরকমের হবে, তা ত স্বাভাবিক। এখানে ত শুধু সংসার কর্ম নয়, শুধু রাজ্যশাসনের কর্ম নয়—ধর্ম আছে তার মূলে। এবং সেটা সদ্‌ধর্ম—যার অন্য নাম ছিল বৌদ্ধ ধর্ম।

একটু আগে নেপালের রাজকন্যার সঙ্গে তিব্বতে পবিত্র ধর্মের প্রচার হল, শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসার ঘটল।

কয়েক বছর পরে তিব্বতের রাজা চীনের রাজকন্যাকেও বিয়ে করেন। আগের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন মন্ত্রী সম্ভোট। এবার কিন্তু আরেক মন্ত্রী সম্বন্ধ আনলেন, রাজার ওপর যাঁর প্রভাব ছিল আরও বেশি।

চীনের কাহিনীতে বলে যে, চীনের সম্রাট তিব্বতের রাজাকে অনেক উপহার পাঠিয়েছিলেন আর বন্ধুত্বের চুক্তি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিব্বতের পক্ষ থেকে দাবী এল যে, চীনের রাজকুমারীকে তাদের রাজার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে।

চীন তাতে রাজী হল না। তখন তিব্বত দু'লক্ষ সৈন্য নিয়ে চীন আক্রমণ করল। আট বছর যুদ্ধের পর চীনের সম্রাট তাই-সুঙ তাঁর মেয়ে ওয়েং চেঙ কুং চু-কে তিব্বতরাজ স্রং-সান্-গাম্পোর সঙ্গে বিয়ে দিতে বাধ্য হলেন।

তার মানে হচ্ছে যে, দুই সতীনের ঝগড়া, রেষারেষি আর ক্ষমতার লড়াইয়ের সব রকম পরিবেশই তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে এই বোধ হয় প্রথমবার সুয়োরাণী দুয়োরাণীর গল্পের কাহিনী একটু অন্য রকম হয়ে দাঁড়াল।

এই দুই রাণীই ছিলেন বৌদ্ধ আর তাঁদের দুজনের প্রভাবেই রাজা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলেন। চীনের ইতিহাসে আছে যে, রাজা চীনের

সংস্কৃতির দিকে খুব আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। সে-দেশের লোকের আচারব্যবহার চালচলন পোশাক-আশাক সবই তাঁর খুব পছন্দ হল। তাঁর নিজের দেশের অনেক প্রথাকেই তিনি অসভ্য মনে করতে লাগলেন। সামন্ত আর বড়লোকদের ছেলেদের চীনে লেখাপড়া শিখতে পাঠালেন। চামড়া আর বনাতের বদলে কারুকার্যময় কাপড় আর চীনা রেশমের রাজপোশাক বানিয়ে নিলেন।

তিব্বতের ইতিহাসকারেরা অবশ্য অতটা স্বীকার করেন না—বিশেষ করে লেখাপড়ার বিষয়ে। তাঁরা পরিষ্কার লিখে গেছেন যে, মন্ত্রী সম্ভোট নিজে বাছাই করা এক দল তিব্বতীকে নিয়ে আর্যভূমি অর্থাৎ ভারতে গিয়েছিলেন এবং সেই দেশ থেকে বিদ্যা আর অক্ষর লেখার লিপি নিয়ে এসেছিলেন। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা তিব্বতী লিপি আর ব্যাকরণের সঙ্গে ভারতীয় লিপি আর ব্যাকরণের খুব কাছাকাছি মিল আছে দেখে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ভারতীয় উৎসটার কথাই ঠিক।

বিদ্যাচর্চার ব্যাপারে এই রকম ভিন্ন মত থাকলেও সব তিব্বতীরাই কিন্তু একমত যে, নেপালী রাণী ও চীনা রাণী দুজনেই সে-দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে এক যোগে কাজ করেছিলেন।

অর্থাৎ দুয়োরাণী-সুয়োরাণীর যে চিরকালের রেষারেষির গল্প আমরা শুনি, তা ধর্মের রাজ্য তিব্বতে ঘটেনি ঠিক সেইভাবে।

রাজার এরকম সাধু সংকল্প আর চেষ্টাকে প্রজারা এত সম্মান দিয়েছিল যে, তারা তাঁকে অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের অবতার বলে মনে করত। তাঁর দুই রাণীকে তারা দেবীর আসনে বসিয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও রাজা এবং রাণীদের এভাবে দেবতার মতো পূজো করা হয়েছে কিনা সন্দেহ।

তিব্বতীরা এই দুই রাণীকে এত ভক্তি করত যে, তাঁদের কোন ছেলেমেয়ে যে হয়নি, সেটাও তাঁদের দেবীত্বের একটা প্রমাণ বলে ধরে নিয়েছিল।

নেপালী রাণী নিজের দেশ থেকে তারা-দেবীর মূর্তি আনিয়েছিলেন,

আর চীনা রাণী আনিয়েছিলেন শাক্যমুনির মূর্তি। বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি তিব্বতে সেই প্রথম আনা হল। রাজধানীর নাম হল লাসা অর্থাৎ দেবতার ধাম। সেখানে চীনারাণীর আনা শাক্যমুনির মূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হল নেপালী রাণীর চেষ্টায়। চীনারাণীর নাম হল শ্বেত তারা আর নেপালীরাণীর পরিচয় হল নীল তারা।

এঁদের দুজনের মধ্যে এত ভাব আর মতের মিল সম্বন্ধে অবশ্য পশ্চিমের পণ্ডিতেরা পুরোপুরি একমত হতে পারেননি। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব তাঁরাই সে-দেশে ভালভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার ফলেই পরে বৌদ্ধধর্মের অন্যান্য মতবাদ আর দীপঙ্করের আগমন সম্ভব হয়েছিল।

॥ ৬ ॥

ঠাকুরমার ঝুলি থেকে টুক্ ক'রে ইতিহাস বেরিয়ে আসতে পারে কি? সোনার পাথরবাটি কি হওয়া সম্ভব? অথচ রাজপুত্র দীপঙ্করের জীবনে তা হয়েছিল। এমন একটি রূপকথা এখানে বলছি যার তুলনা ঠাকুরমার কোনও ঝুলিতেই পাওয়া যাবে না। সত্যিকথা বলতে কি, পৃথিবীর কোনও রূপকথাতেই হয়ত নেই এমন একটা অলৌকিক গন্ধ। এই কাহিনীটির মধ্যে এমন সব তত্ত্বকথা আছে, যা আমাদের চিরকালের আদর্শ। শুধু তাই নয়, আমাদের এই রাজার কুমারের জীবনাদর্শের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত পুণ্যকর্মের কাহিনীও সেটি।

রূপকথা আর পুণ্যকথা এমনভাবে ক'টি গল্পে মিশে আছে?

তাছাড়া ঠাকুরমার ঝুলি ত একেবারেই গল্প। লিখিত-পড়িত কোন প্রমাণই নেই সে-সব গল্পকথার।

এখন যে-গল্পটি বলছি সেটি কিন্তু একাধিক তিব্বতী ইতিহাসেই লেখা আছে। তার মানে, কিছু পরিমাণ সত্য তার মধ্যে নিশ্চয়ই ছিল। বাংলার পুরানো ইতিহাসের মধ্যেও তার সমর্থন পাই।

লামা তারানাথ নামে একজন প্রখ্যাত তিব্বতী পণ্ডিতের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে, বাংলার সম্রাট গোপাল আর দেবপালের রাজত্বকালে অর্থাৎ এগার শ' বছর আগে ওদন্তপুরী নামে একটি অতি বিখ্যাত মন্দির তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কেমন ক'রে সেই মন্দির তৈরির টাকা পাওয়া গেল আর কেমন ক'রে একজন উপাসক তা সম্ভব ক'রে তুললেন, সেটা বড় মজার গল্প। বিশ্বাসের যোগ্য নয়, কিন্তু অবিশ্বাস্যের ছাইটুকু যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে দিলে আসল কথাটুকু বুঝতে অসুবিধা হবে না।

মগধের কাছে একজন অতি পবিত্র চরিত্রের তির্থিক সন্ন্যাসী থাকতেন। যে সব সন্ন্যাসী তীর্থক্ষেত্রে বা পুণ্যস্থানে গায়ে ভস্ম মেখে আর কপালে চন্দনের ফোঁটা কেটে বাস করতেন, তাঁদের বলা হত 'তির্থিক'। সেই তির্থিক সন্ন্যাসীটির অলৌকিক সব ক্ষমতা ছিল। তিনি একবার শবসাধনা করবেন ইচ্ছা করলেন। আমাদের দেশে কাপালিকেরা এবং কোনও কোনও তান্ত্রিক-সন্ন্যাসীরা শ্মশানে বসে শবদেহ নিয়ে পূজা প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ড চর্চা করত। এই তির্থিক সন্ন্যাসীও তাই করতে চাইলেন।

কিন্তু সেজন্য এমন একজন সঙ্গী দরকার যিনি হবেন খুব বলবান, যাঁর কোন রোগ নেই আর ন'টি গুণ তাঁর মধ্যে থাকতে হবে। তাঁকে হতে হবে সত্যবাদী, পণ্ডিত, নির্ভীক, বহুবিদ্যাধর এবং আচার-বিচার প্রক্রিয়ায় নিষ্ঠাবান, পারদর্শী। অমন একটা সাংঘাতিক সাধনায় এমনই সবদিক দিয়ে সুদক্ষ সুপটু সঙ্গী চাই। কিন্তু এহেন লোক কোথায় পাওয়া যায়?

পাওয়া গেল একজনকে। কিন্তু তিনি হিন্দু নন, তিনি ছিলেন বৌদ্ধ উপাসক। তবে সাধনার পথে অন্য ধর্মের লোক হওয়াটা কোন বাধা নয়। ভারতবর্ষের মানুষের সব ধর্মেই এই একটি বিশেষত্ব দেখা যেত।

বৌদ্ধ বললেন, আমি তির্থিকের সহকারী হব, সেটা কেমন ক'রে

সম্ভব ?

তির্থিক বললেন, তোমাকে ত তির্থিক হতে হবে না। আমরা দুজনেই সাধনা করব। আমাদের লক্ষ্য ত একই। তা ছাড়া এই সাধনায় যা সাংসারিক লাভ তোমার হবে অর্থাৎ ধনরত্ন পাবে, তা সবই তোমার ধর্মের প্রচারকার্যে নিয়োগ করতে পারবে।

উপাসক তাঁর গুরুর কাছে নির্দেশ চাইলেন। সব ব্যাপারেই নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। ইচ্ছামত কিছু করা কোন ধর্মেই চলত না। গুরু সম্মতি জানালেন আর উপাসক সেই তির্থিকের সঙ্গে শবসাধনায় বসলেন।

এইবার আরম্ভ হল অলৌকিক কাণ্ড। তির্থিক বললেন, সাধনা করতে করতে যখন প্রায় সফল হয়ে আসবে, তখন শব তার জিভটা বের ক'রে দেবে। সে-সময় উপাসক যদি চট্ ক'রে জিভটি ধরে ফেলতে পারেন, তাহলেই মহাসিদ্ধি লাভ হবে। প্রথম বারের চেষ্টাতেই যদি ধরতে না পারা যায়, তাহলে হবে মাঝারি রকমের সিদ্ধি। আর যদি তৃতীয় চেষ্টায় ধরা যায়, তাহলে মোটামুটি রকম সাফল্য হবে। কিন্তু যদি সেবারও ধরা না যায়, তাহলে মৃতদেহটি জীবন্ত হয়ে উঠে দু'জন সাধককেই গিলে ফেলবে।

উপাসক দু'বার ব্যর্থ হলেন। তৃতীয় বারেও না পারলে ঐ শবদেহ যে হঠাৎ জেগে উঠে এই দুই জলজ্যান্ত সাধুকেই ফেলবে গিলে !

হায় রে রাক্ষস-খোক্কসের গল্প ! সেখানে প্রাণধারী জীবের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। আর এ যে মড়ার সঙ্গে লড়াই ! সেই মড়া বেঁচে উঠে জীবন্ত মানুষদেরই খেয়ে ফেলবে ! কি করা যায় এ-হেন অবস্থায় ? কোনও রূপকথাতেই ত এরকম লড়াইয়ের কথা বলে না ! কি হবে উপায় ?

উপাসক এবার শবদেহটির একেবারে মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে বসলেন। শবদেহ এবার জিভ বের করলেই নিজের দু'পাটি দাঁত দিয়ে

ঐ জিভ ধরে ফেলবার জন্য তৈরি হলেন। এবার মরি-বাঁচি ক'রে তিনি মড়ার জিভ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে কামড়িয়ে ধরে ফেললেন।

হরি, হরি! এ কী হল! কোথায় গেল মড়ার জ্যান্ত জিভ! এ যে একখানা খাপ-খোলা তলোয়ার! কোথায় গেল মড়া? এ যে সোনার তৈরি একটা শবদেহ! ঝকঝক করছে খাঁটি সোনা!

এবারও উপাসক নাছোড়বান্দা। তলোয়ারই সই! তিনি সেটাকে টেনে বের ক'রে এনে শবদেহটির চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। করতে করতে শূন্যে উড়ে গেলেন। তারপর আকাশে খুশিমত বেড়াতে আরম্ভ করলেন।

তাই না দেখে তির্থিক বললেন, 'দাও, তলোয়ার আমাকে দাও। ওটা আমারই পাওনা। পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য আমি এই অঘটন ঘটিয়েছি।'

'উঁহুঃ, আমি তাতে রাজী নই। শূন্যে আকাশে ঘুরে বেড়াবার মজা আমি পেয়েছি। সেই মজা আরও বেশি ক'রে আশ মিটিয়ে ক'রে নিই। দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াই। তারপর দেখা যাবে।'—উপাসক বললেন।

এই বলে এক লাফে উপাসক উড়ে চললেন সুমেরুর দিকে—যাকে আমরা বলি উত্তর মেরু। পৃথিবীর মানচিত্রের মাথার মুকুট, ঝকঝকে বরফে ঘেরা। সেখানে চারটি দ্বীপ তিনি দেখতে পেলেন। তাঁর সাধ মিটল। এবার তিনি তির্থিকের কাছে ফিরে এসে তাঁকে তলোয়ারটি দিয়ে দিলেন।

ঘোড়ায় চড়ে রূপকথার রাজার কুমার ঘুরে বেড়ায় আকাশের মধ্যে দিয়ে—না হয়, ময়ূরপঙ্খী নাওয়ে ভেসে যায় দেশ-দেশান্তরে। কিন্তু শুধু তলোয়ার হাতে নিয়ে শূন্যে ঘুরে বেড়ানোর কাহিনী আর কোন অলৌকিক কাহিনীতে বোধ হয় নেই।

তির্থিক খুশি হয়ে তাঁকে বললেন—'তুমি তলোয়ারের বদলে এই

সোনার দেহটা নাও। যত খুশি সোনা কেটে কেটে নাও, শুধু হাড় কেটো না যেন। আর সেই সোনা কোনও অপকর্মে খরচ ক'রো না। যে কোনও পুণ্যের কাজে খরচ ক'রো। তাহলে দেখবে যে, যতটা সোনা তুমি কেটে নিয়েছে, রাতারাতি ততটা সোনা আবার ঐ শরীরে গজিয়ে উঠবে। এই রকম ক'রে তুমি অনেক ভ'ল কাজ করতে পারবে।'

এই বলে তলোয়ারটি হাতে নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। তাঁর সিদ্ধি হয়ে গেল।

আর উপাসকের কি হল ?

সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার — মনে রাখবার মতো ব্যাপার — যার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। কাজেই এই রূপকথাটি শুধু গাঁজাখুরি গল্প নয়, তার মধ্যে অনেক সত্যও আছে, আর তা থেকে শেখবার মতো জিনিসও আছে।

উপাসক সেই সোনা খরচ ক'রে একটি মন্দির তৈরি করালেন। সেখানে শুধু পূজা নয়, শাস্ত্রচর্চাও হতে লাগল। তিনি সুমেরুতে চারটি দ্বীপ দেখে এসেছিলেন। এই মন্দিরেরও চারটি শিখর হল। উড়ে গিয়ে সুমেরু দেখেছিলেন বলে ঐ মহান্ মন্দিরটির নাম হল ওড়ন্তপুরী। একেই পুরানো বৌদ্ধযুগের ইতিহাসে বলা হয়েছে ওদন্তপুরী।

এই মন্দির আর শিক্ষাপীঠ কোনও রাজা বা ধনীর দানে তৈরী হয়নি। সাধারণ একজন উপাসকের অসাধারণ ভক্তি আর ভালবাসার ফলে গড়ে উঠেছিল। পাঁচ শ' জন ভিক্ষু আর পাঁচ শ' জন ভক্ত সেখানে মন্দিরের খরচে থাকতেন, শিক্ষালাভ করতেন, ধ্যান পূজা অর্চনা করতেন।

উপাসক জানতেন যে, তাঁর জীবৎকালের পরে অন্য লোকেরা লোভে পড়ে সেই সোনা অন্য কাজে লাগাতে পারে। তাই তিনি মৃত্যুর আগে সেই সোনার দেহটি মাটিতে পুঁতে ফেললেন। লোভের জিনিস সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখতে নেই।

তার পরের খরচ কি করে চলবে ? তিনি ওড়ন্তপুরী মন্দিরটি রাজা

দেবপালকে দান ক'রে দিলেন। মন্দিরের দায়িত্ব সাধারণ মানুষের হাত থেকে বাংলার সবচেয়ে পরাক্রমশালী সম্রাট গ্রহণ করলেন। ইতিহাসে এরকম একটি আশ্চর্য ঘটনা আর কোথাও আমরা পেয়েছি কি? তিব্বতের ইতিহাস 'সুম্পা' গ্রন্থে এই কাহিনীটি লেখা আছে। রূপকথার রঙটুকু বাদ দিয়ে পড়লেই আসল ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

এই মন্দিরটি ঠিক কোথায় ছিল, তা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি, তবে নালন্দার কাছেই ছিল। একজন তিব্বতী গবেষক মনে করেন যে, পাটনা থেকে রাজগীর যাবার পথে বিহার শরীফের কাছে যে টিলাটি এখনো দেখা যায়, সেটিই ছিল ওড়ন্তপুরী বিহার। এরই ধরনে গড়া হয়েছিল তিব্বতের একটি বিখ্যাত মন্দির; সেই মন্দিরটির চিহ্ন এখনো আছে এবং তারও গড়ন ঐরকম চারিদিকে চারটি চূড়াওয়ালা। তাছাড়া সেই টিলাটি তিব্বতের দিকে ঢালু হয়ে নেমে এসেছিল।

আমাদের রাজার কুমার পণ্ডিত দীপঙ্কর এই মন্দিরটিকে সযত্নে সংরক্ষণ করেছিলেন। নালন্দার জ্ঞানী পণ্ডিতের কীর্তি শুধুমাত্র নালন্দার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এত কাছের এই মন্দিরটিও তাঁর সেবাযত্ন পেয়েছিল। তিব্বতের একাধিক ইতিহাস সেকথা বার বার বলেছে। বিক্রমশিলা আর ওড়ন্তপুরী—দুটিরই সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান আর পার্থিব প্রমাণ আমাদের সঠিক জানা নেই—শুধু জানা আছে, দীপঙ্করের সঙ্গে এ দুটির গভীর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল।

॥ ৭ ॥

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান কেবল একটি মানুষ অর্থাৎ একক ব্যক্তি মাত্র ছিলেন না। বলতে গেলে তিনি চিন্তাশীলতা ও দার্শনিকতার ভাবময় জগতে একটা ধারাবাহিকতার উদাহরণ, একটি ঐতিহ্যের প্রতিমূর্তি।

সেই ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের মূর্তিকে তিব্বতে আনতে চাইলেন রাজা লা লামা য়েশেহদ। কারণ, বিশুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মের স্রোত আবার দেশে বইয়ে দিতে হবে। দেশে যে তান্ত্রিক আচার আর বন-পা'র রহস্যময়



অতীশ দীপঙ্কর

ছবিটি বৌদ্ধ ধর্মাংকুর মহাসভার শ্রদ্ধেয় ধর্মপাল মহাথেরের সৌজন্যে প্রাপ্ত

রীতিনীতি বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে অনেক অশুদ্ধ আচার-আচরণ এনে দিয়েছিল।

কিন্তু মানুষের চিন্তার জগতে কিছু আনব মনে করলেই আনা যায় না। রাজা বিশেষভাবে শিক্ষিত একুশজন শ্রমণকে ভারতে পাঠিয়েছিলেন। তুষারপথের ঠাণ্ডা গরমে, জঙ্গলের সাপ-বাঘের কবলে আর তরাইয়ের জ্বরজারিতে উনিশজনই মারা গেলেন। বাকি দু'জন সংস্কৃত আর বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ ক'রে দেশে ফিরে এলেন। তাঁরা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের ধার্মিকতা আর শাস্ত্রজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতার কথা শুনেছিলেন। কিন্তু সাহস ক'রে ঐ বিরাট পুরুষের কাছে এগোতেই পারলেন না।

রাজার আকাঙ্ক্ষা আরও বেড়ে গেল। তিনি আরেকজন প্রতিনিধিকে এক শ' জন সঙ্গী আর অনেক সোনা দিয়ে আবার পাঠালেন। হিমালয় অতিক্রম ক'রে তাঁরা দীপঙ্করের কাছে এসে রাজার নিবেদন জানালেন। তিনি বললেন, 'আমার তাহলে তিব্বতে যাবার দুটি কারণ হতে পারে। আমি অনেক সোনাদানা পাব আর সেখানকার লোক আমায় ভালবেসে মহাত্মা বলে শ্রদ্ধা জানাবে। কিন্তু প্রথমটা আমি চাই না। আর দ্বিতীয়টাতেও আমার কোন লোভ নেই।'

চোখের জল ফেলতে ফেলতে হতাশ হয়ে এই তিব্বতী পণ্ডিত দেশে ফিরে গেলেন।

তৃতীয়বার দীপঙ্করের সন্ধানে পণ্ডিত পাঠাবার জন্য রাজা নেপালের সীমান্তে এগিয়ে এলেন। যদি আরো সোনা সংগ্রহ করা যায়, তাহলে হয়ত তাঁকে আবার আমন্ত্রণ করা যাবে।

এবার রাজা নিজেই এক শত্রু রাজার হাতে বন্দী হলেন। শত্রু তিব্বতরাজের মুক্তি পণ হিসাবে দাবী করল যে, তিব্বতরাজকে তার ধর্ম গ্রহণ ক'রে তার অধীন হতে হবে অথবা বন্দীর সমান ওজনের সোনা দিতে হবে।

অনেক কষ্টে জোগাড় করা সোনা পরিমাণে সামান্য কম হল।

তখন রাজার ভাইপো আরো সোনা জোগাড় করার চেষ্টা করতে চাইলেন।

বন্দী রাজা বললেন—'বাছা আমার, পরধর্ম গ্রহণ করার চেয়ে প্রাণ দেওয়া ভাল। আর যা সোনা তুমি জোগাড় করতে পেরেছ, তা ফেরৎ নিয়ে যাও। দেশের ধর্মবিহারগুলিতে পূজার জন্য খরচ করো আর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের কাছে দূত পাঠাও। তাঁকে জানাও যে, তাঁর জন্য আর বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের জন্য সোনা জোগাড় করতে গিয়ে আমি বন্দী হয়েছি। তিনি যেন আশীর্বাদ করেন, যেন পরজন্মেও তাঁর আশীর্বাদ পাই। আমার জীবনের বাসনা ছিল যে, তাঁকে তিব্বতে এনে বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করাব। সে সাধ পূর্ণ হল না। আমি তাই "ত্রিশরণে"র দয়া ভিক্ষা করছি।'

এই 'ত্রিশরণ' হল—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—যা আমরা সবাই বৌদ্ধ মন্দিরে এবং নানা সভা-সমিতিতে শুনে থাকি।

রাজা বন্দী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করলেন।

তাঁর ভাইপো রাজা হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার চেষ্টা আবার করা হল। এবার ভারতে এলেন নাগচো নামে এক তরুণ তিব্বতী পণ্ডিত অর্থাৎ লোচব। তিনি আগেই ভারতবর্ষে একবার এসে সংস্কৃত আর বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেওয়া হল এক শ'জন সহচর। আর দেওয়া হল দীপঙ্করের জন্য, তাঁর নিজের খরচের জন্য, পথের প্রয়োজনের জন্য আলাদা আলাদা পরিমাণ সোনা।

এত সোনা সঙ্গে নেওয়াই একটা বিপদ ছিল। আর শেষ পর্যন্ত এত সঙ্গী ত তিনি আনেন নি। পথের সম্বল রইল শুধু বুদ্ধের চরণ-কমলে নিবেদিত প্রার্থনামন্ত্র—'ওম্ মণিপদ্মে হুম্'। যারা দার্জিলিং-এর কাছে ঘুম-শহরে বৌদ্ধমঠে গিয়েছে, তারা সবাই এই প্রার্থনা শুনেছে।

গঙ্গার পারে এক টিলার ওপর বিরাট বিক্রমশিলা ধর্মবিহার।

সেখানে তিব্বতী পণ্ডিতদের জন্য সংরক্ষিত বাড়িতে থেকে নাগচো নামে তরুণ পণ্ডিতের তিব্বতী গুরু গ্যাৎসন পড়াশোনা করতেন। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন—'দীপঙ্করের চরিত্র আর মেধা এমনই উচ্চ স্তরের যে, তিনি তিব্বতে গেলে দেশের সত্যিই উপকার হবে। কিন্তু তিনি বোধ হয় যাবেনই না। তবে এখানে সবচেয়ে প্রভাবশালী হচ্ছেন স্থবির রত্নাকর। তাঁর ছাত্র হয়ে শিক্ষা অর্জন করতে থাক। ধীরে ধীরে দেখা যাবে।'

সময় বুঝে এই দুই তিব্বতী লোচব দীপঙ্করের কাছে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করলেন। জানালেন তিব্বতের বর্তমান কুসংস্কারে আচ্ছন্ন অবস্থার কথা, কেমন করে রাজারা একের পর এক সংস্কার করতে চেষ্টা করেছেন। সবার ওপরে রাজা সা লামার নালন্দা থেকে দীপঙ্করকে আনানোর চেষ্টা এবং সেই চেষ্টা করতে গিয়ে বন্দীদশা ও মৃত্যুর ঘটনাও তাঁকে জানানো হল।

রাজা নিজের মুক্তির বদলে দেশের ধর্মসংস্কার চেয়েছিলেন। আর সেই সৎকর্ম সাধন করতে চেয়েছিলেন দীপঙ্করের মাধ্যমে। সব শুনে দীপঙ্কর এবার অত্যন্ত বিচলিত হলেন। বললেন যে, তিব্বতে এই পরিণত বয়সে তিনি প্রকৃত ধর্মের ও দেশের সেবা হবে কিনা, সে-বিষয়ে তাঁর অন্তর-দেবতার কাছ থেকে নির্দেশ নেবেন। কিন্তু রাজার পাঠানো উপহার সোনা তিনি ফেরৎ দিলেন।

সেই রাতেই তিনি তারা-দেবীর পূজা করলেন। প্রতিমার সামনে মণ্ডল অর্থাৎ গোল ক'রে সাজানো নৈবেদ্য রেখে প্রার্থনা করলেন। দৈব আদেশ চাইলেন তিনটি বিষয়ে—তিব্বতে গেলে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ কোন সেবা হবে কি না—তিব্বতের রাজর্ষির বাসনা সত্যই পূর্ণ হবে কি না। সব শেষের প্রশ্ন নিজের আয়ু এবং সামর্থ্য সম্বন্ধে।

মহাপ্রাণ মানুষ এমন করেই মহা-প্রার্থনা করেন। নিজের মঙ্গল আর মুক্তির জন্য নয়। বিশ্বজনের জন্য।

দীপঙ্কর কেমন ক'রে সব মানুষের প্রতি দয়া আর ভালবাসার শিক্ষা পেয়েছিলেন, সে-সম্বন্ধে একটি চমৎকার তিব্বতী কাহিনী এখানে বলতে হবে।

জম্বুদ্বীপের কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে তিনি একবার মগধে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন এবং বুদ্ধগয়ার মন্দিরে অনেক ধন দান করেছিলেন।

সেখানে একজন বৃদ্ধ সস্ত্রীক বাস করতেন। দেবতা তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, ভিক্ষু দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এখানে আছেন এবং তাঁকে উপহার দিলে অনেক পুণ্য হবে।

বৃদ্ধটি দীপঙ্করকে খুঁজে বের করলেন মন্দিরে, যেখানে তিনি পূজা করছিলেন। বৃদ্ধের উপহার তিনি নিলেন কিন্তু পরে তাঁর মনে হল যে, কাজটা ঠিক হয়নি। ভিক্ষু-জীবনের সম্মান ভোগ করার চেয়ে নির্জনে তপস্যা করা অনেক ভাল কাজ। তাই তিনি কৃষ্ণগিরিতে গিয়ে ধ্যান করে জীবন কাটাতে লাগলেন।

আরেকজন বয়স্ক পণ্ডিত একথা জানতে পেরে দীপঙ্করকে বলেছিলেন, 'আপনি কুলদেবতার স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন, সাধারণ সিদ্ধিলাভও করেছেন। আপনার এখন নিভৃত জঙ্গল পর্বতে ধ্যান ক'রে সময় নষ্ট না ক'রে করুণা ও মৈত্রীর প্রসার প্রভৃতি কাজে আত্ম-নিয়োগ করা উচিত। সেটাই হবে আপনার প্রকৃত সাধনা। প্রাণী-কুলের মঙ্গলের জন্য আপনি সব সৎ কর্ম করুন আজীবন এবং সংসারের শেষদিন পর্যন্ত।

তখন তাঁর মনে পড়েছিল যে, সুবর্ণদ্বীপে (ব্রহ্মদেশে) তাঁর গুরুদেব ধর্মকীর্তিও এই উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই তিনি এবার মানবের কল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলেন।

এইভাবেই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্যোগকর্মগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। তিব্বত যাত্রা আর সে-দেশে এত ত্যাগ স্বীকার ক'রে কষ্টবরণ ক'রে তাঁর ধর্মপ্রচারের মূল উৎস ছিল এখানে।

কাজেই তিনি যে তারা-দেবীর কাছে নির্দেশ প্রার্থনা করবেন, তা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে এই জন্য যে, তিনি যাবেন এমন একটি অজানা দুর্গম দেশে, যেখানে ঘোর তন্ত্রমন্ত্রের চলন আছে। আছে দৈত্যদানব রাক্ষস খোক্কসের কাহিনী—একেবারে ঠাকুরমার ঝুলির গল্প যাকে বলে।

দীপঙ্করের উদ্যোগে তিব্বতে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম প্রচারের গুরুত্ব বুঝতে হলে তার আগের যুগে সে-দেশের বৌদ্ধ ধর্ম কিভাবে প্রচলিত ছিল, তা জানতে হবে। তিব্বতীরা ভূত প্রেত অলৌকিক ঘটনা, এসবে কতখানি বিশ্বাস করত, তাও বুঝতে হবে। ঠাকুরমার ঝুলির গল্পের মতো সেইসব গল্প কিছু এখানে বলছি। এগুলি কিন্তু শুধু মুখে মুখে তৈরি গল্প নয়—তিব্বতের ইতিহাসে লেখা আছে এসব কাহিনী।

খৃসরন সান্ নামে একজন রাজা বৌদ্ধধর্মকে তিব্বতের রাষ্ট্রধর্ম বলে সম্মান দিয়েছিলেন। তিনজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতের প্রভাবে তা সম্ভব হয়েছিল। মজার কথা হচ্ছে এই যে, ভূত প্রেতের গল্পগুলি এই তিন পণ্ডিতের তিব্বত বাসের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল।

শান্তরক্ষিত রাজার এক মন্ত্রীর নিমন্ত্রণে সে-দেশে গিয়েছিলেন। তাঁর ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কিছু লোক খুব হট্টগোল করলেন। সে-রকম ঘটনা ত অনেক দেশেই নতুন ধর্মপ্রচারের সময়ে হয়েছিল। এদেশে কিন্তু শয়তান আর অপদেবতারা নাকি জেগে উঠেছিল প্রবল বিরোধিতা করবার জন্য। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছিল। তাকে বিদায় দেওয়া হল এ জন্য যে তাঁর ওদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য আসার ফলেই নাকি একটা শহর বানে ভেসে গেল, একটা রাজবাড়িতে বাজ পড়ল, দেশে মড়ক শুরু হল। কিন্তু তিনি পরামর্শ দিয়ে গেলেন যে, গুরু পদ্মসম্ভবকে নিয়ে এলে তিনি মায়ামন্ত্রের জোরে সে-দেশের ভূত প্রেত আর অপদেবতাদের শায়েস্তা করতে পারবেন। তিনি নাকি তা করতে পেরেছিলেন আর তাদের সকলকে নিজের দলের মধ্যে টেনে আনতে পেরেছিলেন।

তার ফলে শান্তরক্ষিত তিব্বতে আবার ফিরে আসতে পেরেছিলেন এবং এই দুই পণ্ডিত মিলে বৌদ্ধধর্ম চারিদিকে প্রসারিত ক'রে দিতে পেরেছিলেন।

কিছুদিন পরে একজন চীনা বৌদ্ধের সঙ্গে এদের শিষ্যদের তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল এবং ভারতবর্ষ থেকে রাজা আরও একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ ক'রে এনেছিলেন। তাঁর কাছে চীনা পণ্ডিত হার মেনে গেলেন।

লক্ষ্য করতে হবে যে, ভূত প্রেতে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও তিব্বতে ধর্ম নিয়ে হিংসাত্মক লড়াই হত না।

পদ্মসম্ভবের নামে তিব্বতে অনেক গল্প আছে। তাঁর জন্মকাহিনীও অলৌকিক। তাঁর জন্মের সময়ে অশেষ আলোর উৎস অমিতাভ বুদ্ধ নিজে নতুন অবতার রূপে জন্ম নিয়েছিলেন। তার লক্ষণস্বরূপ সে-দেশের একটি পবিত্র হ্রদে বিদ্যুতের মতো লাল আলো এসে পড়েছিল একটি সুন্দর পদ্মফুলের ওপর। আর সেই পদ্মফুলের পাপড়িগুলির ওপরে একটি দেবশিশু বসে ছিল। সেজন্য এই নবজাত শিশুর নাম দেওয়া হয়েছিল পদ্মসম্ভব।

তিনি বাল্যকাল থেকেই অনেক রকম অলৌকিক ব্যাপার দেখাতে পারতেন বলে তিব্বতী রূপকথায় আছে। এগুলি সব তিব্বতী বইতে লেখা আছে, আর এগুলি সবাই সত্য ঘটনা বলেই বিশ্বাস করত। দু'-একটি তিব্বতী রূপকথার গল্প এখানে বলা যাক।

একবার এক দানবী দুটো পাহাড়ের মধ্যে পদ্মসম্ভবকে পিষে ফেলে শেষ ক'রে দেবার চেষ্টা করেছিল। তিনি নিজের দৈবক্ষমতায় আকাশে উড়ে গিয়ে পাহাড়ের জাঁতাকলকে এড়িয়ে গেলেন। তখন সেই দানবী তার বশ্যতা স্বীকার করল আর তাঁর ধর্মে দীক্ষা নিল। সেই ধর্মে তন্ত্রের সঙ্গে মেশান ছিল সৎ আচরণ আর সাধু জীবনযাত্রার উপদেশ।

আরেকবার এক দানবী তার ওপর বজ্রবিদ্যুৎ ছুঁড়তে লাগল। তিনি দানবীর বরফের আস্তানাকে গলিয়ে একটা হ্রদে পরিণত করে দিলেন। সেই হ্রদ গরমে টগবগ ক'রে ফুটতে লাগল আর দানবীর হাড় পর্যন্ত সিদ্ধ হয়ে গেল। তখনও সে ফুটন্ত জল থেকে বের হয়ে আসছে না দেখে তিনি একটা বজ্র ছুঁড়ে মারলেন! এবার দানবী উঠে এসে পদ্মসম্ভবের অধীনতা স্বীকার করল আর তাঁর ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করল। দানবীকে তখন একটি ভাল বৌদ্ধ নামও দেওয়া হল।

বিশেষ লক্ষ্য করবার ব্যাপার হচ্ছে যে, এই সব তিব্বতী কাহিনীতে ধর্ম আর অধর্মের লড়াইয়ের ভিত্তি আছে আর সবগুলিতেই ধর্ম হয়েছে জয়ী।

আরো লক্ষ্য করতে হবে যে, পাপ শুধু যে হেরে গেছে তা নয়, পুণ্যের কাছে মাথা নত করেছে, পুণ্যবান হয়ে উঠেছে—অর্থাৎ ধর্মেরই জয় হয়েছে পুরোপুরি সব দিক দিয়ে।

তিব্বতে এই রকম চিন্তাভাবনার পরিবেশ ছিল হাজার-বারো শ' বছর আগে। তার মধ্যে সেদেশে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের আবির্ভাব হতে পেরেছিল।

॥ ৯ ॥

একবার স্বপ্নে তারা-দেবী দীপঙ্করকে তিব্বতে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কাছেই একটি পাহাড়ে ছোট্ট মন্দির আছে। সেখানে এক সাধিকা তাঁকে এ সম্বন্ধে নির্দেশ দেবেন।

সকালে সেখানে গিয়ে দীপঙ্কর তারা প্রতিমার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

কোথা থেকে কেউ জানে না—একজন যোগিনী সেখানে আবির্ভূতা হলেন। তাঁর কেশরাশি পূজার ভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনিই প্রশ্নগুলির উত্তর দিলেন—'বৎস, তুমি তিব্বতে গেলে সেদেশের মানুষের অনেক

অনেক উপকার হবে। বিশেষ করে উপকার হবে একজন উপাসকের, এবং তাঁর মধ্যে দিয়ে কল্যাণ হবে সমস্ত দেশের।

কেউ কেউ বলেন, সেই উপাসক হচ্ছেন ব্রমটন নামে দীপঙ্করের প্রধান শিষ্য এবং উত্তরাধিকারী। আবার কেউ বলেন, সেই উপাসক হচ্ছেন ভাবীকালের দলাই লামা। একের পর এক ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রকর্তা হয়ে দলাই লামারা তিব্বতকে চালিয়েছেন।

এই দলাই লামা প্রথাটি প্রবর্তিত হয় দীপঙ্করের শিক্ষা ব্যবস্থা আর সংস্কারের ফলে।

মঙ্গোলভাষায় 'দলাই' কথার অর্থ হচ্ছে সাগরের মতো বিরাট।

দীপঙ্করকে যোগিনী আরও বলেছিলেন,—'কিন্তু বৎস, তোমার আয়ু বিশ বছর কমে যাবে তিব্বতে গেলে। ঐ দেশে যাবার ফলে তুমি ৯২ বছরের বদলে মাত্র ৭২ বছর বাঁচবে।

দীপঙ্কর তখনই মনস্থির করে ফেললেন। নিজেকে ভালবাসার চেয়ে মানুষকে ভালবাসা অনেক বড়। ভগবান বুদ্ধের এই বিধান। তিব্বতের কল্যাণেই হবে পৃথিবীর মঙ্গল। সুতরাং তার চেয়ে বড় কিছু কাম্য হতে পারে না।

কিন্তু দৈব নির্দেশও যাচাই ক'রে নেওয়া দরকার—বিশেষ ক'রে সবটুকু সিদ্ধান্তই যখন তাঁর নিজের মনেই ঠিক ক'রে নিতে হচ্ছে।

তিনি বজ্রাসনে অর্থাৎ বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দিরে গিয়ে আবার পূজা দিয়ে নির্দেশ নিতে চাইলেন। একজন আচার্য তাঁকে জানালেন যে, সেই মন্দিরে বাদামী জটাজুটধারিণী এক বৃদ্ধা যোগিনী আছেন। তিনিই সঠিক নির্দেশ দিতে পারবেন।

বজ্রাসনে যাবার পথেই এক মহাপুণ্যবতী যোগিনীর সঙ্গে দেখা হল। দীপঙ্কর তাঁকে মনে মনে প্রণাম ক'রে প্রশ্নগুলি জানালেন।

যোগিনী তাঁকে বললেন,—'অবশ্যই তুমি তিব্বতে যাও। তোমার স্বাস্থ্য বা আয়ুর যা হয় হোক—অসংখ্য মানুষের মঙ্গল তুমি করতে পারবে।'

দীপঙ্কর বুঝলেন যে, স্বয়ং আর্যতারা দেবী মানবীর রূপ ধরে এই আদেশ দিয়ে গেলেন।

বজ্রাসনে বজ্রতারার মন্দিরে গিয়ে তিনি বাদামী জটাজুটধারিনী বৃদ্ধা যোগিনীর সাক্ষাৎ পেলেন। ইনিও সেই একই আদেশ ও ভবিষ্যৎবাণী করলেন এবং বললেন যে, তাঁর তিব্বত গমনের ফলে এমন একজন



সন্ন্যাসী লামা

উপাসকের প্রথা শুরু হবে, যে ধার্মিক ব্যক্তি আত্মার অন্ধকার দূর ক'রে দিতে পারবেন আর ভবিষ্যৎ জন্মে বৌদ্ধধর্মের রহস্যগুলি অভ্যাস ক'রে সম্পূর্ণতা লাভ করবেন।

এই উপাসক হচ্ছেন দলাই লামা। এই দলাই লামা উপাসক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ভিত্তি এইভাবেই দীপঙ্করের উদ্যোগেই সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে রহস্যময়, সবচেয়ে অজ্ঞাত, একাধারে ধর্মনেতা এবং রাষ্ট্রপিতার ব্যবস্থা হল এই 'দলাইলামা' প্রথা।

খ্রীষ্টধর্মেও এককালে পোপ ছিলেন খ্রীষ্টানদের ধর্মপিতা আর ভ্যাটিকান রাজ্যের অধিপতি। এখনও সেই প্রথা আছে, তবে আগের তুলনায় পোপের ক্ষমতা অনেকটা কমে গেছে এবং অলৌকিক রহস্য কখনো তাঁকে ঘিরে রাখেনি।

তুষারের দেশ, তন্ত্রমন্ত্রের রাজ্য তিব্বত। তার সঙ্গে কি রোম বা ভ্যাটিকান রাজ্যের তুলনা হয় ?

তা ছাড়া, পোপকে সৃষ্টি করেছিলেন একজন প্রবল পরাক্রমী সম্রাট শার্লেমান।

আর, দলাই লামার সৃষ্টি হয়েছিল কোনও রাজার প্রতাপে নয়—ধর্মের প্রভাবে।

ইতালিয়ান পর্যটক মার্কো পোলোর লেখা একটি কাহিনী এখানে মনে পড়ে।...ভীষণ নিষ্ঠুর দিগ্বিজয়ী চেঙ্গিজ খাঁ প্রায় আট শ' বছর আগে তিব্বত জয় করেছিলেন। তাঁর বংশধর চীনের সম্রাট কুবলাই খাঁ এমন একটি ধর্মপ্রথার খোঁজ করছিলেন, যা তাঁর সাম্রাজ্যের জনগণের অর্ধসভ্য সম্প্রদায়গুলিকে একই সূত্রে সুসংহত ক'রে রাখতে পারবে।

আমাদের মহাভারতেও আছে—যা মানুষকে ধারণ ক'রে রাখতে পারে, তাই হচ্ছে ধর্ম। এমন সহজ উদার আর পরিষ্কারভাবে ধর্মের বর্ণনা বোধ হয় আর কোথাও করা হয়নি।

এই উদ্দেশ্যে কুবলাই খাঁ সকল ধর্মের চূড়ামণিদের ডেকে পাঠালেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন দীপঙ্করের পাঠানো তিব্বতে প্রবর্তিত শাক্য-পা

বৌদ্ধধর্মের সেরা লামা আর পোপের পাঠানো খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের এক নেতা।

সভ্যতার প্রথম যুগে, এমন কি দু-তিন শ' বছর আগেও, অলৌকিক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিয়ে মানুষকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হত। তন্ত্রমন্ত্রের কারসাজি জানতে হত।

সেই অনুসারে কুবলাই খাঁ তাঁদের বললেন, 'আপনারা এমন কিছু অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম দেখান, যা আপনাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে।'

খ্রীস্টানরা আশ্চর্য ক'রে দেবার মতো কোনও ক্রিয়াকর্ম দেখাতে পারলেন না। বৌদ্ধ লামার অলৌকিক ক্ষমতার বলে সম্রাটের সুরার পাত্রটি আপনা থেকে তাঁর ঠোঁটে উঠে এল!

তিনি শাক্য-পা লামাকে বৌদ্ধ লামা ধর্মের শিরোমণি বলে ঘোষণা করলেন। তাঁকে তিব্বতের ধর্ম ও রাষ্ট্রের অধিপতি ক'রে দিলেন। বিনিময়ে শুধু একটি প্রতিদান চাইলেন যে, চীনের সম্রাটদের অভিষেক আর পুণ্যস্নান করিয়ে দেবেন প্রধান লামা।

তিব্বতী পণ্ডিতদের সাহায্যে শাক্য-পা চীনের ধর্মগ্রন্থগুলি থেকে অনুবাদ ক'রে ও মূল থেকে মিলিয়ে মঙ্গোলীয় ভাষায় এক বৃহৎ লামা ধর্মগ্রন্থ তৈরি করলেন। পৃথিবীর একটি বিরাট অংশ এইভাবে দীপঙ্করের শিক্ষা ব্যবস্থা ও ধর্মসংস্কারের ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী উপকৃত হল।

শুধু তাই নয়। পনের শতকে দীপঙ্করের সংস্কার করা ধর্মপ্রথা 'কদম্-পা' আরও পবিত্রভাবে গড়ে উঠল। তার নাম হল 'গেলুগ্-পা' অর্থাৎ পুণ্যপথ।

এই শতাব্দী পর্যন্ত তিব্বতে সেই পথ চলে আসছে। সব দেশেই এমনভাবে একই মূল ধর্মের অনেক শাখা-প্রশাখা, অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের মন সব সময়েই নতুন কিছুর খোঁজে, নতুন ভাবধারা নিয়ে, নতুন পথে আরও এগিয়ে যেতে চায়।

তিব্বতে দীপঙ্কর সেই মহান্ ধারাই চালু ক'রে গেছেন।

বিক্রমশিলায় পুরো তিন বছরের অপেক্ষা। সেই সঙ্গে ধর্মশিক্ষা। তরুণ তিব্বতী পণ্ডিত নাগচো এতদিন সেখানে থাকার পর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের তিব্বত রওনা হবার সময় হল।

নাগচো তাঁর গুরু স্থবির রত্নাকরের কাছে বিদায় নিতে গেলেন।

গুরু বললেন—'হে আয়ুষ্মান্, দীপঙ্কর বিহনে অন্ধকার হয়ে যাবে ভারতবর্ষ। তিনি দেশের বহু প্রথা-প্রতিষ্ঠানের কাণ্ডারী। তাঁর বিদায়ের পরে অনেক মঠ শূন্য মনে হবে। এদিকে ভারতবর্ষের পক্ষে অশুভ ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি। তুরস্কের সৈন্যদল এদেশে এসেছে। আমি ভয়ানক চিন্তিত। তবু তুমি দীপঙ্করকে তোমার দেশে নিয়ে যাও। তাতে সমস্ত মানব সমাজের কল্যাণ হবে।'

যাত্রাপথে দীপঙ্কর ভারতবর্ষে ও নেপালে বিভিন্ন জায়গায় মঠ স্থাপন করেছিলেন।

যে সব সন্ন্যাসী তীর্থক্ষেত্রে বা পুণ্যস্থানে গায়ে ভস্ম আর কপালে চন্দনের ফোঁটা কেটে বাস করতেন, তাঁদের তির্থিক বলা হত। ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশ এই তির্থিকদের কাছে পবিত্র একটি স্থান ছিল। তাঁদের আচার্য ছিলেন পনের জন। কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁদের নিজেদের ধর্মমত সম্বন্ধে দীপঙ্করের সঙ্গে আলোচনা করলেন। আলোচনা করে সন্তুষ্ট হলেন তাঁরা, আর সম্মান ও ভালবাসার চিহ্ন হিসাবে তাঁকে একটি ছাতা উপহার দিলেন।

ছাতা ছিল সন্ন্যাসীদের প্রতি সম্মানের চিহ্ন। পায়ে হেঁটে তাঁরা পথে ঘাটে জঙ্গলে রোদ বৃষ্টি মাথায় ক'রে ধর্ম প্রচার করতেন। ভগবানের আশীর্বাদ তাঁদের ছায়া দেয়। রাজছত্রের চেয়ে মূল্যবান হচ্ছে সন্ন্যাসীর এই ছত্র।

কুম্ভমেলায় গেলে দেখা যায় বড় বড় ধর্ম সম্প্রদায়ের মিছিলের মধ্যমণি গুরুর মাথার ওপর রয়েছে প্রকাণ্ড বাহারী ছাতা। সম্প্রদায়ের শিষ্যদের কাছে সেই ছাতা রাজার রাজছত্রের চেয়েও বেশি সম্মানের বস্তু। হাজার বছর আগে সারা ভারতবর্ষেই এই ছাতার চল ছিল।

সন্ন্যাসীদের ছাতার মহিমা সম্পর্কে তিব্বতী বইতে অনেক বর্ণনা আছে। দীপঙ্করের কাহিনীতেও আছে ছাতার কথা।

দীপঙ্করের সময়ে বাংলার বৌদ্ধরা প্রায়ই ধর্ম আর শাস্ত্র সম্বন্ধে তর্কযুদ্ধে তির্থিকদের কাছে হার মেনে যেতেন। তির্থিকদের তীর্থক্ষেত্রে যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডে সমস্ত সময় কাটত। দীপঙ্করের পাণ্ডিত্যে আর তর্কযুদ্ধে নিপুণতার কল্যাণে অনেক বৌদ্ধ যাঁরা আগে তির্থিক হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা আবার বৌদ্ধমতে ফিরে এসেছিলেন।

একজন তির্থিকের মেয়ে দীপঙ্করকে দেখে খুব পছন্দ করলেন। ভাবলেন যে, তাঁকে যদি ভিক্ষুর অবস্থা থেকে তির্থিক সংসারী ক'রে নেওয়া যায়, তাহলে তাঁকে বিয়ে করতে পারবেন। তাঁর পরামর্শ অনুসারে তাঁর বাবা তখন দীপঙ্করকে দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলেন। কিন্তু মেয়েটির বাবা নিজেই শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম নিতে বাধ্য হলেন।

একবার পাঁচটি ছত্রধর এক দক্ষিণী তির্থিক পণ্ডিত দীপঙ্করকে তর্কযুদ্ধে নামতে আহ্বান জানালেন—'আপনি হচ্ছেন বৌদ্ধদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পণ্ডিত আর আমাকে সবাই বলে অ-বৌদ্ধদের মধ্যে সেরা বিদ্বান। আসুন, আমরা তর্কের লড়াইয়ে নামি।'

মগধের রাজা নিজে হলেন সেই তর্কসভার বিচারক আর সেখানে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সেই বিদ্বান পণ্ডিতকে তর্ক মাধ্যমে শাস্ত্রের নানা প্রশ্নোত্তরে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ক'রে পণ্ডিতকে এবং তাঁর সমস্ত শিষ্যকেও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত ক'রে নিলেন।

এর পরে আট ছত্রধারী এক পণ্ডিত এবং তার পরে তের ছত্রধারী আরও একজন পণ্ডিতও দীপঙ্করের সঙ্গে শাস্ত্রবিষয়ে তর্কযুদ্ধে নেমেছিলেন। দুজনেই কিন্তু হেরে যান।

তির্থিক সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে শৈব, বৈষ্ণব, কপিল প্রভৃতি নানা মতের উপাসক ছিলেন। একবার একজন তির্থিক বিদ্বেষবশতঃ দীপঙ্করকে শেষ ক'রে দেবার জন্য আঠারজন ডাকাতকে পাঠিয়েছিলেন।

ডাকাতরা দীপঙ্করের সৌম্য দেবতার মতো মুখখানি দেখে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি শুধু বললেন—'ওদের যেন ভগবান দয়া করেন।'

এখানে যীশুখ্রীস্ট আর শ্রীচৈতন্যদেবের কাহিনী মনে পড়ে যায়। তাই না? তাঁরাও ত এমনিভাবেই পাপীদের ক্ষমা করবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন।

নেপাল সীমান্তেও সেখানকার এক জমিদার দীপঙ্করের পিছনে ডাকাত লাগিয়েছিল। তারাও দীপঙ্করের সামনে তাদের তীর ধনুক ফেলে যেন মন্ত্রবলে নিস্তব্ধ হয়ে নিশ্চল মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

নেপালে আর্য স্বয়ম্ভু নামে একটি পবিত্র মন্দির ছিল। দীপঙ্কর সেখানে স্থানীয় রাজা আর প্রজাদের মঙ্গলের জন্য পূজা দিলেন। তারাও এই মহান্ পণ্ডিতকে সম্মান দেখাল।

পথে দীপঙ্কর একজন কালস্থবির অর্থাৎ মহাপণ্ডিতের কাছে গেলেন। তাঁকে পুরো ছয় দিন ধরে 'পারমিতা' নামে একটি ধর্মগ্রন্থ পড়ে শোনালেন। তাঁকে বোঝালেন যে, বোধি অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান পেতে গেলে মন্ত্র আর পারমিতা দুটিই আয়ত্ত করা দরকার।

এরপর দীপঙ্কর রচনা করেছিলেন 'চর্যা সংগ্রহ প্রদীপ'। তাঁর সঙ্গী লোচব অর্থাৎ বৌদ্ধ পণ্ডিত মূল শাস্ত্র থেকে তিব্বতী ভাষায় তা অনুবাদ করেছিলেন।

ভাগ্যিস্ করেছিলেন! না হলে এই রচনার এবং আরও অনেক প্রাচীন রচনার অস্তিত্ব অজানা থেকে যেত।

চর্যা হচ্ছে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে প্রথম উদাহরণ। এগুলি ছিল ধর্মবিশ্বাস আর মানুষের সুখদুঃখ সম্বন্ধে গান এবং কবিতা। তার চেয়ে বেশি পুরনো বাংলা সাহিত্যের নমুনা আমরা এখনো পাইনি।

নেপালের রাজা অনন্তকীর্তি তাঁর দরবারে দীপঙ্করকে প্রভূত সম্মান আর আদর-যত্ন সহকারে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি রাজাকে উপহার দিলেন একটি হাতি। আর বললেন যে, এই হাতিকে যেন অস্ত্রশস্ত্র

বহন করতে দেওয়া না হয়, যুদ্ধের কাজে ব্যবহার না করা হয়। হাতিটিকে কেবলমাত্র শাস্ত্রগ্রন্থ, পুঁথিপত্র, পবিত্র জিনিসপত্র আর দেবমূর্তি যেন বহন করতে দেওয়া হয়।

এই উপহারের বদলে দীপঙ্কর কি চাইলেন, তা আমাদের মনে রাখা উচিত। মান নয়, ধন নয়, সংসারের কোন সুযোগ-সুবিধা নয়—শুধু চাইলেন যে, একটি ধর্মবিহার সেখানে স্থাপন করা হোক।

আর সেটি দীপঙ্করের নিজের নামে নয়—ঐ ধর্মবিহারটির নাম হবে সেই স্থানের নামে। তাই সেই ধর্মবিহারের নাম হল 'থানবিহার'।

সেদেশের রাজার ছেলে নিজে রাজ্যপাটের দাবি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। দেশ ছেড়ে আসবার পরে রাজপুত্র দীপঙ্করের প্রথম দীক্ষিত শিষ্য হলেন আর এক রাজপুত্র!

॥ ১১ ॥

রাজপুত্র দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সন্ন্যাসীর বেশে চলেছেন ঘোড়ায় চড়ে।

একা নয়। কেবলমাত্র সঙ্গে আসা সন্ন্যাসী-সাথীদের মধ্যে নয়। তিব্বতরাজ পাঠিয়েছিলেন এক শ' ঘোড়সওয়ার—দেশের সীমান্তে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য। সবাই শাদা অলঙ্কারে সাজানো ঘোড়ায় চড়া। ঘোড়সওয়ারদের সঙ্গে চারজন সেনাপতি। প্রত্যেকের দু'পাশে ষোলজন ক'রে বর্শাধারী। মোট চৌষট্টি জন বর্শাধারী।

বর্শাগুলির মাথায় মানুষ-মারা তেকোণা লোহা নয়, ছিল শাদা পতাকা। বাকি সবারই হাতে ছোট ছোট পতাকা। আর কুড়িটি সাটিনের ছাতা। বাঁশি, শিঙা, আর হরেক রকম তিব্বতী বাজনার সুরেলা অভ্যর্থনা। কিন্তু ভাবে গম্ভীর। মন্ত্রপাঠ হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে—'ওম্ মণিপদ্মে হুম্'।

সবার নেতৃত্বে এসেছেন রাজার নিজের প্রতিনিধি। তাঁর সঙ্গে পাঁচজন সহচর আর নানা উপহার। সোনা, মধুপর্ক আর চা।

চীনা ড্রাগনের মূর্তি আঁকা চা-দানি। কিন্তু তিব্বতী ধরনে বানানো চা।

সেই চা পরিবেশন ক'রে রাজ-প্রতিনিধি বললেন—'সম্মানিত মুনিবর, আপনি অনুগ্রহ ক'রে এই দেবভোগ্য পানীয় গ্রহণ করুন। এটি হচ্ছে স্বর্গের ইচ্ছাতরুর নির্যাস।'



চা উৎসব

উঁচু আসন থেকে দীপঙ্কর বললেন—'যোগাযোগ ত বড়ই শুভ মনে হচ্ছে। এই দামি আধারটি শুধু কি দেখতেই চমৎকার! এর মধ্যে আছে ইচ্ছাতরুর জীবনদায়িনী রস্। এর নাম কি ?'

তিব্বতী লোচব বললেন—'পূজনীয় গুরুদেব, এর নাম চা। তিব্বতের সাধুরা এটি পান করেন। চায়ের পাতা খাওয়া হয় না বলেই জানি। তবে চায়ের পাতাগুলি সোডা, নুন আর মাখন মিশিয়ে ফোটানো জলে ঘুটে নেওয়া হয়। তার নির্যাসই হচ্ছে চা। এর অনেক গুণ আছে।'

দীপঙ্কর বললেন—'তিব্বতের সাধুদের পুণ্যের ফলেই এমন চমৎকার পানীয় চা-য়ের স্বষ্টি হয়েছে।'

চা-য়ের প্রশংসা ক'রে তিব্বতে একটি স্তোত্রও চালু আছে। লোকে বলে, সেটি দীপঙ্করেরই রচনা।

সকালে-বিকালে ঘরে ঘরে বসে চা খাওয়ার সময়, সেই বরফের দেশে অজানা রাজ্যে যিনি হাজার বছর আগে মানুষের মঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছা নির্বাসন বরণ করেছিলেন, তাঁর কথা অনেকেরই হয়ত মনে পড়ে!

আরও এগিয়ে এসে দীপঙ্কর মানস সরোবরে পৌঁছলেন। জায়গাটি যেমন পবিত্র, তেমনি স্থন্দর মনে হল। তিনি সেখানে পরলোকগত আত্মাদের উদ্দেশে তর্পণ করলেন। তিব্বতে তর্পণের কোনও নিয়ম ছিল না। তাঁর শেখানো তর্পণের প্রথা এখনো চালু আছে। তাঁরই নামে সেই তর্পণপ্রথাকে বলা হয় 'দীপংমা'।

এবার তিন শ' ঘোড়সওয়ার আর চারজন সেনাপতি চললেন দীপঙ্করের সঙ্গে সঙ্গে। সবারই পোশাক পরিচ্ছদ শাদা। শান্তির রঙ।

প্রধান সেনাপতি তাঁকে সম্বোধন করে বললেন—'সবচেয়ে বেশি গুণবান জ্ঞানবান আপনি। তিব্বতের সবাকার প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে দেবতার রূপ ধরে আপনি আর্যভূমি থেকে এসেছেন। এমনই আপনার

কৃপা। আপনি চিন্তামণি। আপনার কাছে যা প্রার্থনা করি তা-ই আপনি দিতে পারেন। আমাদের দেশে ধর্ম সম্পদ নেই। আপনার কাছে তা আছে।…আপনার আগমনে আমাদের সুখী দেশ আরও সুখী হল।'

'চিন্তামণি' কথাটির মানে ছিল এমন একটি মণি যার কাছে যে কোন জিনিস চাওয়া হোক, তাই পাওয়া যায়।

তিব্বতের প্রধান ব্যক্তিরা চেয়েছিলেন ধর্মের প্রসার, ধর্মের সংস্কার। দীপঙ্করের কাছে তাঁরা তার পথনির্দেশ পেয়েছিলেন পুরো মাত্রায়।

দীপঙ্করকে এই সেনাপতি আরও বলেছিলেন, 'প্রজাদের ধর্মগুণ আর সঞ্চিত পুণ্যের ফলে রাজার শক্তি আর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। রাজা আর প্রজা উভয় পক্ষের পুণ্যের বলে সবদিকেই বিবাদ-বিসম্বাদ আর অশান্তি দূর হয়ে গেছে। এখন আপনার আগমনে আমরা আরও উন্নতি লাভ করব। বোধিসত্ত্বের প্রতি ভক্তিতে সুমেরু পর্বতের মতো অবিচল থাকব। আমাদের প্রার্থনা যে, আপনি আমাদের রাজার মঠ থোলিনে একবার অনুগ্রহ করে পদার্পণ করুন।'

এই রকম অভ্যর্থনা ক'রে তিন শ' ঘোড়সওয়ারের সামনে দীপঙ্করকে রেখে তাঁরা বন্দনাগান করতে করতে এগিয়ে চললেন।

প্রধান সেনাপতি পথে আবার দীপঙ্করকে সম্মান-প্রণিপাত জানিয়ে বললেন—'বর্তমান যুগে দীপঙ্কর হচ্ছেন বুদ্ধের প্রতিভূ আর বৌদ্ধধর্মের শিরোমণি। তিনি সারা জগতের শ্রদ্ধার পাত্র। পবিত্রতার জন্য সমস্ত জীবিত প্রাণী, এমনকি দেবতারাও তাঁর পূজা করেন।'

দীপঙ্করের তিব্বতী জীবনীকারের ভাষায়—'তাঁর ঘোড়া মৃদুমন্থর গতিতে সোনার রাজহংসের মতো সাবলীলভাবে এগিয়ে চলল। মাঝে মাঝে যোগবলে তিনি ঘোড়ার রেকাবী না ছুঁয়েই হাতখানেক ওপরে উঠে যেতে লাগলেন—সবাই তাঁকে দেখুক, অনুভব করুক—এই ছিল তাঁর অভিলাষ।'

ষাট বছর বয়সের দীপঙ্করের সুন্দর চেহারা, সৌম্য ভাবভঙ্গি আর

প্রসন্ন হাসি তাঁকে দেবতাদের মতো সম্মানের যোগ্য করে তুলেছিল। সংস্কৃত মন্ত্র তিনি উচ্চারণ করছিলেন আর প্রত্যেকটি পংক্তির শেষে নিজের মাতৃভাষায় স্বস্তিবাচন করছিলেন।—

এরপর তিব্বতরাজের প্রধানমন্ত্রী করজোড়ে দীপঙ্করকে অভ্যর্থনা জানালেন—'হে প্রভু, আমাদের ভক্তি ও ধর্মভাবনার প্রধান, আপনি সকল জীবিত প্রাণীর প্রতি করুণা ক'রে নিজের দেশ ছেড়ে এত দূরে এসেছেন, আমাদের সৎ শিক্ষার সুযোগ দিতে, পথের পরিশ্রম উপেক্ষা ক'রে।'

এই কথা বলে প্রধান মন্ত্রী কিংখাবের কাজ করা বিরাট একটি অবলোকিতেশ্বরের চিত্র দীপঙ্করকে উপহার দিলেন। দীপঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে সেটিকে পূতপবিত্র ক'রে দিলেন। তারপর প্রত্যেক মন্ত্রী শ্রদ্ধাভরে তাঁকে শাদা উত্তরীয় অর্ঘ্য দিলেন।

তিনি যে অতি+ঈশ—সবার বড়—মহাপ্রভু! তাই দীপঙ্কর হলেন অতীশ।

॥ ১২ ॥

'আমি তাঁর চরণে প্রার্থনা করছি—
যিনি সর্বত্র সম্মানিত।
তুষিত স্বর্গে যাঁর নাম বিমল আকাশ,
আর্যদেশে যাঁর নাম দীপঙ্কর,
হিমবন্ত দেশে যাঁর নাম শ্রীমৎ অতীশ।'

এই স্তোত্র রচনা করেছিলেন অতীশের প্রধান শিষ্য ব্রমটন। তাঁরই জীবদ্দশায়। এই ব্রমটনই তাঁর প্রচলিত মতবাদ আর ধর্মাচার প্রচার ক'রে নিজের দেশে অমরতা লাভ করেছেন।

অতীশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই 'বোধিপথ প্রদীপ'—তিনি নিজে এই বইয়ের যে টীকা রচনা করেছিলেন, সুদূর চীনদেশে তার একটি অনুলিপি পাওয়া গেছে। তাতে প্রথমেই রচয়িতার নাম আছে—

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তারপর লেখা আছে—'বর্তমান যুগে বঙ্গাল দেশে জন্ম নিয়েছেন ভগবান বুদ্ধের অবতার'। বইখানি অনুবাদ করেছিলেন আর পরিশুদ্ধ ক'রে নিয়েছিলেন ভারতীয় মহাপণ্ডিত গুরু বোধিসত্ত্ব বাঙালী শ্রীদীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞানপাদ আর লোচব ভিক্ষু জয়শীল (অর্থাৎ নাগচো)।

বিদেশে একজন বাঙালীর এত বিপুল সম্মান আর তাঁর একক প্রচেষ্টায় একটি ভিন্ন দেশে ধর্মপ্রথার এত ব্যাপক এবং আমূল সংস্কার অবশ্য সহজে হয়নি।

লামা প্রথার একটা উদাহরণ দিলেই এই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাবে। তিব্বতের এক রাজা খানিকটা উদার আর পরিচ্ছন্ন মতবাদ প্রচার করেছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে নির্ভুল ধর্মশাস্ত্র আর সেগুলির সঠিক ব্যাখ্যা আনিয়ে লামাদের সেই অনুসারে চলতে বলেছিলেন। কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির ফলে রাজার ভাই লান দারমা ক্রোধের বশে রাজাকে খুন করলেন। যে সব লামা শুদ্ধ বৌদ্ধ প্রথাগুলি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের ওপর দুর্বিষহ অত্যাচার চালালেন। মন্দির মঠ ধ্বংস ক'রে, শাস্ত্র পুঁথিগুলি পুড়িয়ে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না—অহিংসার সেবক লামাদের জোর ক'রে কসাইয়ের কাজ করতেও বাধ্য করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, শাক্যমুনির মূর্তি দেশে প্রতিষ্ঠা করার পর থেকেই প্রজারা দুঃখী আর গরিব হয়ে পড়েছে। তাঁর কুশিক্ষার ফলেই তাদের মতিগতি চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে।···ধনীরাও তাঁকে উৎসাহ দিল।

একজন লামা এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য ভৌতিক নৃত্যের নাচওয়ালা সাজলেন। মাথায় কালো টুপি প'রে, ঘুরে ঘুরে রাজপ্রাসাদের সামনে নাচতে লাগলেন। প্রজারা রাজাকে শয়তান বলে মনে করত—তারা বলত যে, রাজার চুলের নিচে দুটো শিং লুকোনো আছে। কাজেই লামাও খুব হুঁশিয়ার হ'য়ে সাজপোশাক প'রে রাজাকে খুন করবার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছিলেন। তাঁর জোব্বার

চওড়া হাতার ভেতরে লুকোনো ছিল তীর ধনুক।

রাজা সেই লামার নাচ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। নিজের খুব কাছে সেই লামাকে ডেকে নিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে লামা প্রথম প্রণামের ভঙ্গিতে ধনুক বাঁকিয়ে নিলেন—দ্বিতীয় প্রণামের সময়



কালো টুপি পরা শয়তান নর্তক

পরালেন তীর — আর তৃতীয় প্রণামের ছলে ছদ্মবেশী লামা তীর মেরে রাজাকে ঘায়েল ক'রে ফেললেন। আর চেঁচিয়ে বলে উঠলেন — 'আমি হচ্ছি কালো দৈত্য! পাপী রাজাকে এমনি ক'রেই শেষ ক'রে দিতে হয়।'

শুরু হল চারিদিকে হুলুস্থুল। সেই সুযোগে কাছে বেঁধে রাখা কালো ঘোড়ায় চড়ে হত্যাকারী উধাও। আর নদীতে ঝাঁপ। ঘোড়ার গায়ে মাখানো কালো রঙ নদীর জলে ধুয়ে গেল। লামা তাঁর কালো পোশাক উলটিয়ে নিয়ে শাদা পোশাক প'রে শাদা ঘোড়ায় চড়ে নদী থেকে বেরিয়ে এলেন। সে যেন এক জাদুর খেলা!

মাত্র তিন বছর ধরে রাজার অমানুষিক অত্যাচারের ফলে বেশির ভাগ পণ্ডিতই দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

এমনি সব কাণ্ড সেই যুগে সেদেশে হত। এমনই সেই দেশে অতীশ নিয়ে গিয়েছিলেন অহিংসার বাণী, মৈত্রীর ধর্ম, আর শান্তির মন্ত্র। নিজের দেশে তিনি বজ্রযান মতের বৌদ্ধ ধর্মপ্রথা মেনে চলতেন। ক্রমে তিনি তার সঙ্গে মিশিয়ে নিলেন আরও সুনীতিপূর্ণ মহাযান ধর্মপ্রথার পবিত্র শুদ্ধ ব্যাখ্যা। সে-কাজ ছিল অসম্ভব রকম কঠিন ব্যাপার।

ছিল পদে পদে বাধা আর বিরোধিতা।

রিন চেন জান পো নামে পঁচাশি বছর বয়সের এক পণ্ডিত প্রথমেই বাধা দিলেন। খোদ রাজধানীতেই তাঁর ধর্মবিহারে থরে থরে সাজানো ছিল তান্ত্রিক দেবদেবীদের মূর্তি। ছোট বড় মাঝারি নানা রকমের ক্ষমতা রাখত সেই সব দেবদেবী — অবশ্য তান্ত্রিক ভক্ত আর ভীতুস্বভাবের লোকেদের চোখে তাই মনে হত। তিব্বতে তখন প্রায় সবাই সেই পথের পথিক।

অতীশ সেই ধর্মবিহারে ঢুকেই এক নাগাড়ে প্রত্যেকটি মূর্তির জন্য এক-একটি স্তোত্র রচনা করলেন। তারপর পূজারীর মাদুরে এসে বসলেন। একটি মাত্র আসনে একবার বসেই এত স্তোত্র রচনা?

পণ্ডিত আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন — 'কে এসব রচনা করেছে?'

অতীশ বললেন — 'আমি। এবং এই এখনি।'

নিজের চেয়ে চব্বিশ বছরের ছোট এই বিদেশী বৌদ্ধের অসাধারণ ক্ষমতা দেখে বৃদ্ধ শুধু যে আশ্চর্য হলেন, তাই নয়—তিনি অতীশের কাছে বজ্রযানের 'মোহন আয়না' নামে একটি বিদ্যা শিখে নিলেন। ফলে, গভীর ধর্মভাব তাঁর মনে জেগে উঠল। তিনিও অতীশের সঙ্গে একাসনে ধর্মচর্চা করতে চাইলেন।

কিন্তু অতীশ তাঁকে বোঝালেন 'সেটা তো মাত্র বাইরের কথা। হে মহান্ লোচব, আপনার অন্তরের কথা ভেবে দেখুন। আপনার অন্তরে গভীরভাবে উপলব্ধি করুন—পৃথিবীর মানুষের এত দুঃখকষ্ট কেমন ক'রে আমরা সহ্য ক'রে আছি? আর সহ্য করা যায় না। আসুন, তাদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করুন। সেই সাধনার জন্য বুদ্ধের দয়া প্রার্থনা করুন। সাধনা করুন।'

একথা শুনে সেই মহাপণ্ডিত রিন চেন জান পো তাঁর মন থেকে বিদ্যা আর সম্মানের অভিমান দূর করে দিলেন। তিনি একটি মন্দির তৈরি করালেন। তাতে একটার পর একটা তিনটি দরজা রাখলেন সাধনভজনের ঘরে যাওয়ার জন্য। প্রথম দরজার মাথার ওপর লেখা রইল—'এই দরজা পেরিয়ে যদি আমি সংসারের মোহ নিয়ে যাই, তাহলে আমার মাথা যেন দু'টুকরো হয়ে যায়।'

মাঝখানের দরজার মাথায় লেখা রইল—'এই দরজা পেরিয়ে যদি মুহূর্তের জন্যও নিজের স্বার্থ চিন্তা করি, তাহলে আমার মাথা যেন দু'টুকরো হয়ে যায়।'

শেষ দরজার মাথায় লেখা রইল—'এর ওধারে যদি এক মুহূর্তের জন্যও সাধারণ চিন্তা নিয়ে ঢুকি, তাহলে মৃত্যু যেন আমার মাথা দু'টুকরো ক'রে দেয়।'

মোহ, স্বার্থ, আর সাধারণ চিন্তা সব বিসর্জন দিয়েই ত ত্রিরত্নের শরণ নিতে হবে। ভগবান বুদ্ধ, ধর্ম, আর ধর্মের সঙ্ঘ—এই তিনটি

হচ্ছে বৌদ্ধদের রত্ন। তাদের শরণ নিতে হবে।

অতীশের পবিত্র ধর্মমতের কাছে তখনকার তিব্বতী গুরুদের আন্তরিক নতি স্বীকারের অনেক প্রমাণ ইয়োরোপের পণ্ডিতেরা নথিপত্র খুঁজে, পাথর ও তামার প্রাচীন পটের লেখম উদ্ধার ক'রে পেয়েছেন। নাগচো ছিলেন অতীশের উনিশ বছর যাবৎ সঙ্গী—তাঁর মুখে মুখে বলা বাণীর লিপি বা অতীশের সাক্ষাৎ শিষ্যদের লেখা পুঁথির বাইরেও এরকম অজস্র প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এই মহাপণ্ডিত রিন চেন জান-ও তাঁর নিজের লেখা ধর্মগ্রন্থগুলি, এমনকি প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থখানি পর্যন্ত, অতীশকে দিয়ে শুদ্ধ করিয়ে নিয়েছিলেন।

অনেক ধর্মসংস্কারকের অন্ধ গোঁড়ামি থাকে। তার ফলে শুধু দলাদলি হয়, এমনকি যুদ্ধবিগ্রহ পর্যন্ত লেগে যায়। পৃথিবীময় তার প্রমাণ ছড়ানো আছে।

কিন্তু অতীশ গোঁড়ামির কাছেও ঘেষেননি। তিব্বতে অলৌকিক কথা কাহিনী আর প্রেতাত্মার পূজার চল ছিল। বৌদ্ধ ভৈরবী নিয়ে সাধনা, ঘটা ক'রে বলিদান। মারণ, উচাটন, বশীকরণ, শিলাবৃষ্টি নামিয়ে আনা—এই সবে বিশ্বাস ছিল। ছিল রহস্যময় তন্ত্রমন্ত্রের ব্যাপার। সেগুলির মধ্যে থেকে বাহুল্য বর্জন ক'রে সারাংশটুকু তিনি বজ্রযান প্রথার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের মহান্ দর্শন আর নীতিজ্ঞান যা তথাগত বুদ্ধ নিজে প্রচার করেছিলেন, অতীশ তার সবটুকুই তিব্বতে সঞ্চারিত করেছিলেন। তাই তিনি সংহার না করেও ব্যাপক সংস্কার করতে পেরেছিলেন এবং তিব্বতের মানুষকে ধর্মের স্থায়ী সম্পদ দিতে পেরেছিলেন।

তিব্বত নিষিদ্ধদেশ বলেই সবাই জানত। আর তার রাজধানী লাসা ছিল রহস্যে ঘেরা এক নগরী। কোনও বিদেশী পথিক, এমনকি রাজপুরুষের জাত ব'লে এক সময়ে পরিচিত ইয়োরোপীয়রা, বিশেষতঃ ইংরেজরা, তিব্বতে ঢুকতেই পারত না।

এ হেন তিব্বতের রাজধানী লাসায় প্রায় এক হাজার বছর আগে একজন বাঙালী কেমন ক'রে গিয়েছিলেন, কেমন ভাবে তিব্বতীদের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন, সেকথা জানলে আশ্চর্য হতে হয়। শুধু বাংলার কেন, সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন অসম্ভব, প্রায় অলৌকিক ঘটনা কখনো ঘটেনি।

অতীশ যখন লাসার মন্দিরের মধ্যে প্রথম গিয়েছিলেন, তখন দাড়িওয়ালা একজন লম্বা লোক দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন—তাঁর আগমন সার্থক হোক—এই বলে তাঁকে শুভকামনা জানালেন। অতীশ তাঁর দিকে এগিয়ে যেতেই তিনি অদৃশ্য—যেন মন্দিরের ভিতরের অবলোকিতেশ্বরের মূর্তির মধ্যে সেই অভ্যর্থনাকারী মিলিয়ে গেলেন!

অতীশ মনের দুঃখে বলে উঠলেন—'হায়! অবলোকিতেশ্বরকে পেলাম না।'

তিনি আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন—তিব্বতীরা এত সুন্দর মন্দির কিভাবে তৈরি করল। এমন সময়ে এক পাগলিনী সামনে হাজির। জিজ্ঞেস করল—'তুমি কি এই মন্দিরের ইতিহাস জানতে চাও?'

অতীশ মনে মনে বুঝলেন যে, ইনি পাগলিনী নন—আসলে এক যোগিনী। তাই তাঁকে প্রণাম করলেন।

যোগিনী বললেন—'এই মন্দিরের ইতিহাস তুমি এর কলস-স্তম্ভের দশ গজ নিচে পাবে—তবে কাউকে বোলো না যেন।'

সেই জায়গাটি খুঁড়ে ইতিহাস লেখা পাওয়া গেল। কিন্তু সেখানকার ভাণ্ডারী তাঁকে বললেন—'তুমি এই পুঁথি পড়তে পার, অনুলিপি ক'রে নিতে পার, কিন্তু শুধু একদিনের মধ্যে যতটা সম্ভব।'

অতীশের শিষ্য আর সঙ্গী চারজন তাঁর সঙ্গে বসে প্রায় সম্পূর্ণ পুঁথিখানি অনুলিপি ক'রে নিলেন। সেটি এখনও আছে, আর এই কাহিনী লিখে গেছেন তাঁরই জীবনীকার আর শিষ্যসঙ্গী ব্রমটন।

প্রকৃত ধর্মচর্চা এনে দেয় বিনয়। আর সেই বিনয় এবং করুণা দিয়েই বহুমানুষের মন জয় করা যায়। অতীশ দীপঙ্কর এই পথেই সহজভাবে সাধারণ ভাষায় সরল বিবরণে ধর্মের তত্ত্বকথা সাধারণের মনের মধ্যে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন।

এমনি সহজভাবেই অতীশ এক জায়গায় উপদেশ দিয়েছিলেন—'যতদিন তুমি সংসারের জীবন আর ধনসম্পদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখছ, কখনও বলো না যে তুমি ভিক্ষু। কারণ সে-সব হচ্ছে সংসারীর জন্য।'

—'তুমি হয়ত আশ্রমে থাক। তবু যতক্ষণ সংসারের পিছুটান থাকবে বা অপরকে সাহায্য করতে না পারবে, কখনও বলো না যে তুমি মঠে বাস কর, তুমি ভিক্ষু। তুমি এরকম বললে তা সংসারীদের প্রতি মিথ্যা আচরণ হবে। তুমি অন্যকে ঠকাতে চাইলে নিজেই আসলে ঠকবে। ক্ষমা ধর্মের কথা কখনও ভুলো না।'

—'যারা ধর্মপ্রাণ, তাদের তুমি কখনও ঠকাতে পারবে না। গুরু ও দেবতাদের কাছে কি শপথ করেছ তা ভুলো না।'

—'কখনও বলো না যে এটা বড় শক্ত কাজ, তাই কালকের জন্য তুলে রাখছি। এ হেন দুর্বলতা ধর্মের পথে বাধা। মনে রেখো যে, মৃত্যুর সময়েও তুমি অহঙ্কার করতে পার না যে, তুমি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। নিজেকে চেনো, নিজেকে জানো। সেটাই কঠিনতম ধর্ম আচরণ।'

উপনিষদেও ঠিক এই শিক্ষার কথাই আছে—'আত্মানং বিদ্ধি'। খ্রীস্টধর্মেও বলে 'নো দাইসেল্‌ফ'।

অতীশ নিজের জীবনে এই সরল বাণীগুলি মেনে চলেছিলেন। তাঁর নিজের জীবনের পবিত্রতা আর প্রচারিত নীতিকথা সাধারণ মানুষের মনে এমনভাবে আসন লাভ করেছিল যে, সেই আচরণ বিধি তিব্বতের সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গেছে।

একবার এক ভিক্ষুণী তাঁকে একটি দামি উপহার দেয়। প্রতিদানে তিনি উপদেশ দেন—'যারা রুগ্ন, যারা ক্লান্ত, যারা দুঃখী, তাদের সেবা

কর। বৃদ্ধদের এবং পিতামাতাকে সেবা কর। সেটাই প্রকৃত ধর্ম। সেটাই তোমাকে বোধিচিত্ত নিয়ে ধ্যান করার সমান পুণ্য এনে দেবে।'

অতীশের এই বাণীগুলি এই যুগে বারে বারে স্বামী বিবেকানন্দের কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়।

পশ্চিম তিব্বতের রাজা ও বাংলার রাজা ন্যায়পাল ছিলেন অতীশ দীপঙ্করের বিশেষ ভক্ত। ন্যায়পালকে তিনি 'বিমলরত্ন লেখন' নামে একখানি পত্রে লিখেছিলেন—'লাভ করো না, লোভ করো না। মৈত্রী আর করুণা তোমার মনে বিরাজ করুক।

রাজা আর জনগণ, সকলের জন্যই ছিল তাঁর একই বাণী। তাই ত তিনি হয়েছিলেন সর্বজনপূজ্য। তাই তিনি সত্যিই অতীশ।

॥ ১৩ ॥

একবার এক ভক্ত এসে অতীশকে নিবেদন করলেন—'মহাপ্রভু, দারুল-পা নামে একজন লোক গুরু বলে নিজেকে জাহির করছে। বলছে তার অনেক "অভিজ্ঞান" আছে। আছে নাকি অনেক অলৌকিক শক্তি। সে নানাভাবে প্রতারণা প্রবঞ্চনা ক'রে বহু লোককে বিভ্রান্ত করছে। আপনি তাকে অনুগ্রহ ক'রে পরাভূত করুন। না হলে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের পথে নিদারুণ বিঘ্ন সৃষ্টি হবে।'

অতীশ হেসে বললেন—'মনে হচ্ছে, তাকে পরাভূত করবার জন্য আমায় একটা বেশ বড় বাহিনীই পাঠাতে হবে।'

তারপর তাঁর উপদেশ মতো সেই ভক্তটি নিজের মুখের মধ্যে একটি ছোট মটর দানা রাখলেন, আর সেই দারুল-পা গুরুর কাছে গিয়ে বললেন—'বলুন তো গুরু মহারাজ, অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের অতীত জন্মগুলির কাহিনী। আর তাঁর ভবিষ্যৎ জন্মগুলির কাহিনী। অর্থাৎ বৌদ্ধ জাতক কাহিনী।'

দারুল-পা একটুও দ্বিধা না ক'রে অনেক কাহিনী বলে গেল।

সে-সব কাহিনী প্রমাণ করবার কিংবা মিথ্যা বলে অগ্রাহ্য করবার ত

কোনও উপায় নেই। একজন গুরু বলছেন। কুসংস্কারে ভরা দেশের ভক্তরা বিশ্বাস ত করবেই। মারণ উচাটন বশীকরণ এ সব তান্ত্রিক ক্রিয়া ওদের মনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল যে!

তখন অতীশের সেই ভক্তটি দারুল-পা গুরুকে বললেন—'আচ্ছা গুরুজী, এবার বলুন ত—আমার মুখের মধ্যে কি আছে?'

জন্মজন্মান্তরের খবর পর্যন্ত দৈবশক্তি দিয়ে দিব্যচক্ষে সব যে দেখতে পাচ্ছিল, সে কিন্তু এই সামান্য জড়জাগতিক মটর দানাটির কথা বলতেই পারল না!

মোট কথা, দারুল-পা গুরু এইভাবে অতি সহজে পরাভূত হয়ে গেল। উপস্থিত সবাই অট্টহাস্য ক'রে সেই প্রতারক গুরুর প্রবঞ্চনা-মূলক ধর্মপ্রচার অগ্রাহ্য ক'রে দিল।

অতীশ মহাপ্রভুর ধর্মকথার ভিত্তি হচ্ছে—সুনীতিচর্চা, সৎচরিত্র গঠন, আর সাধুকথা পর্যালোচনা। সেগুলি সকলকে সহজ সরলভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে। এজন্যই মানুষের মনে স্থায়ী আসন পেয়েছিল অতীশের সে-সব কথা। তাঁর প্রচারিত ধর্মপ্রথা এসব কারণেই দ্রুতগতিতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা তিব্বতে।

অতীশের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কেও অনেক কাহিনী প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। আগেকার কালে যেরকম রটনা খুব সহজ ছিল। যীশুখ্রীস্টের নামেও এরকম অনেক কাহিনী আছে। যদিও পাশ্চাত্য দেশে মানুষ সব কিছুই বৈজ্ঞানিক আর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাচাই ক'রে নিতে চায়, তবুও সে-সব কাহিনী প্রচলিত আছে।

প্রতি যুগেই ধর্মগুরু আর মহাত্মাদের নামে অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনী প্রচলিত হয়ে যায়—যদিও সেগুলি তাঁদের মাহাত্ম্য-মর্যাদাকে স্পর্শ করতে পারে না, কারণ তাঁদের মহত্ত্ব ঐ সব কাহিনীর ওপর নির্ভর করে না—করে তাঁদের প্রেম, করুণার মাধ্যমে মানবসত্তাকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত ক'রে তোলার উপযোগী বাণীর ওপর।

প্রাচীন বাইবেলে আমরা 'টেন কম্যাণ্ডমেণ্টস্'-এর কথা পড়েছি।

প্রকৃত মানুষ হবার জন্য সেই দশটি অনুশাসন। সংসারে ঠিক পথে চলার জন্য প্রচারিত হয়েছিল খ্রীস্টধর্মের সেই দশটি নীতি—পবিত্র সাধু জীবন যাপনের দশটি নিয়ম।

ঠিক তেমনি দশটি নিয়মবিধি অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের উপদেশাবলীর মধ্যে আমরা পেয়েছি। ভারতীয় ভাষায় এর নাম চর্যা—তিব্বতীভাষায় 'পিয়দ-পাই-গ্লু'।

এই দশটি বিধিনিষেধ হচ্ছে—

(১) কাউকে মেরো না,
(২) চুরি করো না,
(৩) সমাজে নিন্দিত আচরণ কোরো না,
(৪) মিথ্যা কথা বলো না,
(৫) গালাগালি দিয়ো না,
(৬) বোকার মতো বাজে কথা বলো না,
(৭) পরনিন্দা করো না,
(৮) লোভ করো না,
(৯) অপরের ক্ষতি চিন্তা করো না,
(১০) অধর্ম চিন্তা করো না।

তিব্বতী বইতে এই উপদেশাবলী শুরু হয়েছে আর্য মঞ্জুশ্রীকে প্রণিপাত জানিয়ে। 'কুমারভূত' অর্থাৎ চিরতারুণ্যের মূর্তপ্রতীক এই মঞ্জুশ্রী অর্থাৎ দিব্য বোধিসত্ত্ব। তিনি দেবী সরস্বতীর মতো অনন্তযৌবন, অনন্তপ্রজ্ঞার আধার। তিব্বতে সব শিক্ষার উপাসনার সূচনা হয় তাঁরই বন্দনা দিয়ে। সকল বিদ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতীক তিনি। দেশকাল পাত্র নির্বিশেষে চিরকালের জন্য তাঁর প্রয়োজন। সেইজন্য সব রচনাতেই মঞ্জুশ্রীর বন্দনা দিয়ে শুরু করেছেন অতীশ। আর তিব্বতবাসী সকলেও অতীশকেই মঞ্জুশ্রী বলে অন্তরের মাঝে স্থান দিয়েছে। তাদের ভাষায় তিনি হচ্ছেন 'জোবার্‌জে পাল-দান অতীশ'—মহামান্য পরম মহান্ অতীশ। তিব্বতী কথ্যভাষায় 'অতীশ' শব্দটিকে

বলা হয় 'অতিশা'।

এছাড়া অতীশ বন্দনা করেছেন বজ্রাসনের। বুদ্ধের একটি নাম বজ্রাসন। তাছাড়া বজ্রাসন হচ্ছে গয়া—বৌদ্ধধর্মের পবিত্রতম স্থান। সেখানেই অতীশ শিক্ষালাভ করেছেন এবং শিক্ষাদানও করেছেন।

'চর্যাসংগ্রহ প্রদীপ' গ্রন্থে অতীশ লিখেছেন—'প্রথমে চিত্তকে জাগাও' আর বোধিসত্ত্বকে স্মরণ কর। ধর্মের সূত্রগুলি পাঠ কর, শাস্ত্রের সুবচন শোন। তোমার ব্রতের পবিত্রতা রক্ষা কর কায় বাক আর চিত্ত দিয়ে। তাদের কলুষিত হতে দিয়ো না। নিজের আচার ব্যবহার পবিত্র রাখ আর পরিমাণে বেশি খেয়ো না।'



মঞ্জুশ্রী দেবী

খুব সহজ ভাষায় তিনি যা করতে বলেছেন, তার মধ্যে কোন দুর্বোধ্যতা বা জটিলতা নেই—নেই সন্দেহ বা ভুল বোঝবার সম্ভাবনা।

আর মন স্থির ক'রে পূজা করা ? সে বড় কঠিন কাজ।

তারও সরল ব্যবস্থা অতীশ দিয়েছেন।—

—'রাতের প্রথম ও শেষভাগে ঘুমিয়ো না। যোগাসন অভ্যাস কর। অসৎ চিন্তাকে মন থেকে সরিয়ে দাও। মনকে ভাল চিন্তায় পূর্ণ ক'রে রাখ। সেই মনঃসংযোগই হচ্ছে সবচেয়ে বড় যোগসাধনা।'

—'রাতের শেষভাগে ঘুম ভেঙে উঠে হাত মুখ ধুয়ে নাও। সহজ হয়ে বসে ধর্মচিন্তা কর। বাজে চিন্তা বা কল্পনা মনে এলে ধ্যান ছেড়ে উঠে পড় আর ঐ সব কিছুই যে মায়া, তা মনে করতে থাক। সেই সময়ে পূজা কর, প্রার্থনা কর, আর 'সপ্তাঙ্গ অর্চনা' কর। অর্থাৎ সর্বদেহ পূজায় নিবেদন কর। তারপর আবার ধ্যান শুরু ক'রে দেখ।'

ভাল হবার ভাল থাকবার কত সহজ উপায়! সকল দেশে সকল যুগেই আমরা সবাই অনায়াসে এই অভ্যাসগুলি শুরু ক'রে দেখতে পারি।

অথচ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী চূড়ামণি ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তিব্বতে পদার্পণের তিন বছরের মধ্যেই তিনি 'বোধিপথ প্রদীপ' রচনা করেন। তাতে আছে মাত্র ৬৬টি শ্লোক। তার মধ্যেই বৌদ্ধ ধর্মচিন্তা আর আচার-প্রথার পরিপূর্ণ চিত্র রয়েছে। তাঁর ধর্মপ্রচারক জীবনের সার বিশ্বাস-নীতি বিধৃত আছে ঐ গ্রন্থটিতে এবং তার প্রভাব বৌদ্ধ ধর্ম জীবনে হয়েছে খুবই ব্যাপক।

বৌদ্ধধর্মের একটি উন্নত মতবাদ 'মহাযান' পন্থার শিক্ষানীতি মেনে নিয়ে তিনি সর্বজনীন বিশ্বজনীন মুক্তির উপাসক ছিলেন। বর্তমান যুগের চিন্তাধারায় যাকে বলা হয় 'সর্বজনীন মানবতা'—তারই প্রথম প্রবর্তক ছিলেন সম্ভবত তিনিই। অতীশকে আমরা বলতে চাই প্রথম বাঙালী ইউনিভার্সাল ম্যান।

দার্শনিক হিসাবে অতীশ দীপঙ্কর বৌদ্ধধর্মের 'মাধ্যমিক' পন্থার

পণ্ডিত ছিলেন এবং 'শূন্যবাদ' অর্থাৎ নাস্তিকতা প্রচার করেছিলেন। এই শূন্যবাদ অর্থাৎ মহাশূন্য থেকেই সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে, এটা বাঙালী কবি ও সাধুসন্তদেরই মতবাদ ছিল এবং অতীশ যে বাঙালী ছিলেন, এটি তারই একটি পরোক্ষ প্রমাণ।

তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন—'ছোটবড় সব প্রাণীর সঙ্গে "মৈত্রী চিত্ত" নিয়ে সম্বন্ধ কর। সব দুঃখীজনের দিকে তাকাও, তাদের দুঃখ দুরবস্থার হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য চেষ্টা কর। শুধু নিজে তাড়াতাড়ি সিদ্ধিলাভের জন্য, আলোকপ্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত হয়ো না। সংসারে পরের দুঃখ দূর করবার জন্য ব্রত নাও।'

এ যুগে স্বামী বিবেকানন্দেরও এই বাণী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—

'বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব মুক্তি সমাধিতে ?'

একটু আগে অতীশের যে শূন্যবাদের কথা বলেছি, তা হল এই যে, প্রকৃতির মধ্যে যা স্বভাবত বিরাজ করে আছে, তাকে ত তৈরি করতে হয়নি, সুতরাং সবই সৃষ্টি হয়েছে মহাশূন্য থেকে। আর যার অস্তিত্ব নেই, তার কথা চিন্তা করার দরকারও নেই।

তাছাড়া অতীশ বলতেন, 'এই পৃথিবীর সবই মায়াময়। জীবনের শেষে নির্বাণ এসে সেই মায়াময় বিভ্রান্তিময় পৃথিবী থেকে আমাদের মুক্তি দেয়। শাস্ত্র পাঠ ক'রে, যুক্তিতর্ক দিয়ে চিন্তা ক'রে বুঝে নাও যে, ধ্যানই হচ্ছে মুক্তির এবং নির্বাণের একমাত্র পথ।'

অতীশ বুঝেছিলেন—এ রকম গভীর দর্শন আর তত্ত্বকথা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবে না। তাই তিনি নৈতিক সাধুজীবনের (অর্থাৎ 'উপায়'-এর) প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। 'উপায়' ছাড়া 'প্রজ্ঞা' অর্থাৎ পাণ্ডিত্য যেমন অর্থহীন, তেমনই 'প্রজ্ঞা' ছাড়া 'উপায়'-ও অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে।

এই উদ্দেশ্যে তিনি ছয়টি 'পারমিতা' অর্থাৎ বিশেষ গুণ মানুষের মধ্যে চর্চা করতে বলেছিলেন। সেগুলি হল—দান, শীল (নৈতিক জাবন), ক্ষমা, বীর্য, ধ্যান আর প্রজ্ঞা। প্রথম পাঁচটি হচ্ছে 'উপায়' অর্থাৎ প্রজ্ঞা বা পাণ্ডিত্যকে প্রতিদিনের জীবনে সফল ক'রে তোলার পথে সেগুলির চর্চা একান্ত প্রয়োজন।

অতীশের ধর্মসংস্কারের ফলে 'কদম্-পা' নামে একটি পরিচ্ছন্ন ধর্মপ্রথা প্রবর্তিত হতে পেরেছিল। নোংরামিতে ভরা তান্ত্রিকতাকে এক নিঃশ্বাসে উড়িয়ে দেওয়া যায়নি। কিন্তু অতীশ অতি সযত্নে অধম মধ্যম আর উত্তম তিন ধরনের মানুষের জন্যই শান্তি, উন্নতি আর মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। তাঁর প্রবর্তিত এই 'কদম্-পা' ধর্মপ্রথাই আরও পরিমার্জিত হয়ে পরে 'গেলুগ্-পা' প্রথায় পরিণত হয়েছিল। বহু ব্যাপক হয়েছিল সেই ধর্মপ্রথার প্রভাব। অতীশের 'বোধিপথপ্রদীপ' গ্রন্থখানির বিষরবস্তু ছিল এই ধর্মপ্রথার ব্যাখ্যা।

এক সময়ে পাহাড়ের গায়ে খোদাই-করা উপদেশে সর্বসাধারণের জন্য সম্রাট অশোক—'দেবনাম্ পিয় পিয়দশি অশোক'—বলেছিলেন, 'একমাত্র সত্যের বিজয় হয়ে থাকে ধর্মের মধ্য দিয়ে—সেই বিজয় ইহলোক আর পরলোক দুটিতেই কার্যকর। এই দুই-লোকে ফলদায়ী সেই আনন্দই আমার সকল সন্তানের আনন্দ হোক।'

অতীশ দীপঙ্কর সেই আনন্দেই তিব্বত বিজয় করেছিলেন।

॥ ১৪ ॥

পৃথিবীতে কখনও কোনও দেশেই ধর্মের পথ সহজ ছিল না।

খ্রীস্টধর্ম প্রচারের ইতিহাসও আমরা জানি। যীশু কিভাবে মৃত্যুবরণ করেন, তা কেউ কোনদিন ভুলবে না। তাঁর শিষ্যরাও কিভাবে অত্যাচারিত হয়েছিলেন, তা মনে করলেও শিউরে উঠতে হয়।

মনে পড়ে সেই চিরকালের প্রশ্ন : মানুষ কোথায় চলেছে ? কোন্ পথে ?…ল্যাটিন ভাষায় সেই বিখ্যাত দু'টি কথা : কো ভাদিস্ ?

সেই তুলনায় ভারতবর্ষে কোনও নতুন ধর্মমত প্রচার অথবা সংস্কার হয়েছে অনেক ভালভাবে অহিংস পথেই। তার জন্য নির্যাতন বা রক্তপাত অনেক কম হয়েছে। সম্ভবত সেটা দেশের গুণ। এদেশের মানুষের মহত্ত্ব। আর নতুন পথের পথিকৃৎ যাঁরা ছিলেন, তাঁদের শুভ বিচারবুদ্ধি।

তিব্বতের সঙ্গে আর্যভূমির (ভারতবর্ষের), বিশেষ ক'রে বঙ্গালের (বৃহৎ অর্থে বহুদূর বিস্তৃত বাংলা অঞ্চলের) সম্বন্ধ এত গভীর ছিল যে, এদেশের এই মহৎ গুণগুলি হিমবন্ত (তিব্বত) দেশের মধ্যেও আমরা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত দেখতে পাই।

আর অতীশের তিব্বতে ধর্মপ্রচারের মধ্যেই আছে তার পূর্ণ পরিচয়।

তান্ত্রিক আর পণ্ডিতের দল তাঁকে বারে বার ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা নিয়ে কত রকমভাবে প্রশ্ন করেছে। তর্কযুদ্ধ হয়েছে কত বার। কিন্তু খুন-খারাপি হয়নি কখনও।

বিশেষ ক'রে তান্ত্রিক আচার-বিধিগুলির গোঁড়া সমর্থকরা ত অনেক কিছুই হাঙ্গামা করতে পারত। কিন্তু পারেনি কারণ অতীশ নিজে সকল ধর্মাচারের মূলে বিনয় আর ব্রহ্মচর্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সারা জীবনে ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে তিনি বারে বার বলেছেন—'প্রকৃত বৌদ্ধের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার নীতিবোধ আর চরিত্র মাধুর্যে। তার ধ্যানে আর কল্যাণব্রতে।'

ছ'জন তিব্বতী তান্ত্রিক-প্রধান একবার তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন তন্ত্র সাধনা সম্বন্ধে তাঁর মতামতের জন্য। তর্কযুদ্ধ শুরু হলে কোথায় যে তাঁরা শেষ করতেন, তার ঠিক নেই। তিনি নিজের লেখা 'বোধিপথপ্রদীপ' গ্রন্থখানি তাঁদের পড়তে দিলেন। বললেন— 'রাজা বোধিপ্রভ নিজে এইসব প্রশ্ন করেছিলেন, তার সব উত্তর এই গ্রন্থেই আছে।'

ছোট্ট সেই গ্রন্থখানি পড়তে পড়তে মন চলে যায় অন্যদিকে—শান্তির দিকে, ধ্যানের দিকে। সাংসারিক ক্ষুদ্র কলহাদি আর ক্ষমতার

জন্য হিংসাদ্বন্দ্বের অনেক ওপরে।

ঐসব পণ্ডিতেরা তন্ত্রমন্ত্র সাধনার ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। অতীশের কাছে নতুন কথা আর সহজ পথের সন্ধান পেয়ে তাঁরা চিন্তার নতুন আলোর নিশানা পেলেন।

অতীশ তাঁদের বলেছিলেন— 'তন্ত্রসাধনার মূল তত্ত্বটুকুর প্রথম পাঠ হচ্ছে নৈতিকচরিত্র গঠন আর প্রকৃত গুরুর কাছে শিক্ষা।' তিনি যদি সন্তুষ্ট হন যে, তান্ত্রিক অভিলাষী সব পাপ আর কুচিন্তার ওপরে উঠতে পেরেছে, তখনি শিষ্যকে সিদ্ধিলাভের উপযুক্ত মনে করবেন।

সেই স্তরে উন্নীত হওয়ার যোগ্য হলে কোনও শিষ্য কখনোই বলিদান, ব্যভিচার, শত্রুনিপাতের জন্য মাটিতে মন্ত্র পুঁতে রাখা, ঝড়-বৃষ্টির আবাহন করা— এসব সামান্য আর গর্হিত কাজ করতে চাইবেই না।

কোন্ শিষ্য এমন উচ্চ স্তরে উঠতে চাইবে না? এমনই উচ্চ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ক'রে কেমন সহজ অথচ পরোক্ষভাবে অতীশ সেদেশে তান্ত্রিক সাধনার গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছিলেন।

সৎকর্মের সুফলের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সেজন্য শিষ্যেরা তাঁকে 'কর্মপণ্ডিত' বলে অভিহিত করেছিল। ধর্মগুরু অতীশ তাতেই সন্তুষ্ট। বললেন— 'এই নামটুকুও অনেক কল্যাণের কারণ হবে।'

একটি বিরোধীদলের নেত্রী তাঁকে বিব্রত করে তোলার জন্য দলে দলে রাস্তার ছেলে-ছোকরাকে তাঁর পিছনে লাগালেন। তারা কয়েকটা নোংরা কবিতা গাইতে গাইতে অতীশকে বিরক্ত করবার চেষ্টা করত। একজন তাঁর কাছে এসে চেঁচাতে লাগল— 'এই পণ্ডিতটা কিছুই জানে না। এঁর চেলা লোচবেরা কোন কিছুই ঠিকমতো তিব্বতীতে অনুবাদ করে না। এঁর ধর্মপ্রচারের সময়ও নেই, আর রাজারও নেই বুদ্ধি।'

আর একজন কবি কবিতা লিখল যে, অতীশ তিব্বতে আসার পর থেকে দেশে যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা হচ্ছে ধর্ম নয়— রোগ। দেশের

প্রত্যেকটি উপত্যকা আর গ্রাম শ্মশানে পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

অতীশ কিন্তু এসবে ভ্রূক্ষেপও করেননি। শুধু তিনি বলেছিলেন—'এইসব নোংরা নালিশ থেকে হাজার যোজন দূরে থাক। এসব গ্রাহ্য করো না।'

একবার তাঁকে অপদস্থ করার জন্য কয়েকজন শিক্ষক জিজ্ঞাসা করেছিল— 'আপনি পরজন্মে কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন বলুন তো?'

তিনি হেসে বললেন— 'যেখানেই হোক, তোমাদের দেশে নয়।'

— 'কেন?'

— 'কেন? তোমরা যদি ধর্মের উপদেশ মানতে না চাও, ভগবানকে শ্রদ্ধাভরে পূজা করতে না পার, তোমাদের মধ্যে জন্মিয়ে কি লাভ হবে?'

কত সহজ সরলভাবে তিনি তাদের উপদেশ আর শিক্ষা দিয়েছিলেন!

পশুপক্ষীদের প্রতিও অতীশের অসামান্য মমতা ছিল। তিব্বতে আসার পথে তিনি অসহায় তিনটি কুকুর-ছানা পেয়েছিলেন। তাদের তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। বাছুর ছাগল সব রকম প্রাণীই তাঁর যত্ন পেত। তাদের সঙ্গে কথা বলতেন আদর ক'রে জড়িয়ে ধরে। তাঁর এক শিষ্য এর প্রতিবাদ করে জিজ্ঞাসা করেছিল— 'আপনি এমন করেন কেন? আমাদের জমিদার-সামন্তেরা ত এরকম করেন না। তাঁরা এসব পছন্দও করেন না।'

অতীশ উত্তর দিয়েছিলেন— 'আমি প্রাণীদের সবচেয়ে ভালবাসি। তোমাদের সামন্তদের চেয়ে বেশি ভালবাসি। যারা অবলাজীব, তাদের প্রতিই ত বেশি করুণা, বেশি মৈত্রী দরকার।'

আমরাও ত বাংলা কবিতায় পড়েছি— 'জীবে দয়া করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' অতীশ দীপঙ্করের শিক্ষাধারারও সেটি হচ্ছে সারকথা।

একবার চারজন পণ্ডিত তাঁর কাছে এসে মহাযান মতবাদের প্রধান

সিদ্ধান্তগুলি জানতে চাইলেন। খানিকক্ষণ ধ্যান করবার পর অতীশ বললেন— 'অনেকরকম সিদ্ধান্ত আছে, তবে সেগুলির আসল সারমর্মটুকু জানলেই চলবে।'

পণ্ডিতেরা তখন জানতে চাইলেন— 'আসল সিদ্ধান্ত কি ? আর অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলিই-বা সহজে সংক্ষেপে কি ক'রে জানা যাবে ?'

অতীশ দীপঙ্কর তখন বলেছিলেন— 'আসল সিদ্ধান্ত হচ্ছে করুণা। সব প্রাণীদের জন্যই করুণার প্রয়োজন। তাদের দিতে হবে সীমাহীন করুণা। বোধিচিত্তই শুধু দিতে পারে সেই করুণা।'

তথাগত বুদ্ধ, যীশুখীস্ট, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু —এঁরাও সেই করুণার বাণীই প্রচার করে গিয়েছেন।

পশ্চিম তিব্বতের রাজা বোধিপ্রভু তিব্বতের জনগণের পক্ষ থেকে অতীশকে এক শ' 'পাল' সোনা আর মূল্যবান মণিরত্নখচিত সোনার সপ্তরত্ন প্রণামী দিয়েছিলেন। অতীশের উদ্দেশে তিনি স্তোত্র রচনা ক'রে বলেছিলেন— 'যারা আপনার বাণী শুনেছে, আপনাকে স্পর্শ করেছে, প্রত্যেকেই শ্রদ্ধা না ক'রে পারেনি। ইহজগতে আপনার সঙ্গে তুলনা করার মতো কেহই নেই।'

সেই অতুলনীয় অতীশের পদপ্রান্তে বিভিন্ন সময়ে দেওয়া সব সম্পদ, এমনকি তাঁর নিজের উপাস্য মূর্তিগুলিও সবই তিনি তিব্বতে অনেক চৈত্য আর মঠ স্থাপনের জন্য, ধর্মপ্রচার আর সৎ জীবনযাত্রার জন্য দান ক'রে গিয়েছিলেন।

॥ ১৫ ॥

খুবই তাজ্জব কথা যে, বাঙালী জাতি এতদিন এক মহান্ বাঙালী শ্রীঅতীশ দীপঙ্করের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। এই যে তাঁর সম্পর্কে এত ঘটনা, আর রূপকথার মতো অবিশ্বাস্য কাহিনী, এগুলি আমরা কোথায় পেলাম ? আমাদের দেশের কোনো লেখাতেই তো পুরনো কালে এসব পাইনি।

ছেলেবেলা থেকেই আমরা শুনেছি যে, তিব্বত হল ডাকিনী যোগিনী যাদুবিদ্যার দেশ—জোরদার তন্ত্রমন্ত্রের লীলাভূমি। ওদের দেশের বরফ আর লামাদের কথাই বইতে পড়েছি। তবে অতীশ দীপঙ্কর সম্বন্ধে এত খবর কোথায় পেলাম ?

এখন জেনেছি যে, ওদের দেশেই বাঙালী লেখকের রচিত 'চর্যাগীতি' পাওয়া গেছে—তিব্বতী ভাষায় যার নাম 'পিয়দ-পাই-গ্লু'।

আশ্চর্য, এই 'চর্যা' নামের গীতিকবিতাগুলিই বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে পুরনো নমুনা ! কিন্তু আমরা সে-কথা বছর ষাট-সত্তর আগে জানতামই না। বাঙালী নিজের ভাষার সেই ইতিহাসই জানত না।

আরও আশ্চর্য, এই প্রাচীন বাংলার নমুনা আমাদের নিজেদের দেশে কোথাও পাওয়া যায়নি। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে এবং পরে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে গিয়ে সেখানকার রাজদরবারের প্রাচীন গ্রন্থাগারে এই 'চর্যাগীতি' পুঁথি খুঁজে পেয়েছিলেন। অনেক যত্ন ক'রে তাঁর খুঁজে পাওয়া পুঁথিটির ভাষা বাংলা কিনা, তা বুঝতে চেষ্টা করেন। দীর্ঘকাল ধরে পাঠোদ্ধার ক'রে তিনি হাজার বছরের পুরনো সেই 'চর্যাগীতি' অর্থাৎ বাংলা বৌদ্ধ গান ও দোহা সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। ফরাসী পণ্ডিত কর্দিয়ে এই পুঁথিতে তিব্বতী ভাষা ও বাংলা ভাষার পার্থক্য নির্ণয় ক'রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাজে সহযোগিতাই করেন।

শাস্ত্রী মহাশয় অতীশের আরও দু'খানি বাংলা রচনার সন্ধানও পেয়েছিলেন, সেগুলি হল—'বলবীর সাধন' ও 'বলবিধি'। দুটিতেই অতীশ যে বাঙালী, তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তা ছাড়াও অতীশের অনেকগুলি সংকীর্তনের পদ ছিল। একখানির নাম 'বজ্রাসন বজ্রগীতি', একটির নাম 'চর্যাগীতি', আরেকটি 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ধর্মগীতিকা'। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মতো। গানের নাম চর্যাপদ। বাঙালীদের কীর্তনের গানকে পদ বলা হত, তখন তারই পরিচয় ছিল চর্যাপদ। তখনকার দিনে আমাদের দেশে সাধারণ লোক ও মেয়েরা

যে ধরনের ছড়া কাটত, অনেকটা সেই ধরনে এই গানগুলি সরল ভাষায় রচিত হয়েছিল।

খুবই দুঃখের কথা এবং আশ্চর্যের বিষয় যে, অতীশের মূল রচনা আমরা এখনও পাইনি। আরও বেশি আশ্চর্য কথা হচ্ছে যে, চীনের রাজধানী বেজিং-এর লাইব্রেরীতে পাওয়া তিব্বতী ত্রিপিটকে এগুলি পাওয়া গেছে। মূল বাংলা পেলাম না, পেলাম অনুবাদ। কিন্তু ভাবে, ভাবনায় প্রকাশভঙ্গিতে সেগুলি বাঙালীরই সৃষ্টি। আমাদের কাছে তার নিদর্শন এসে পৌঁছল দূর দুর্গম বিদেশ থেকে।

আরও আশ্চর্যের কথা আছে।

ভারতবর্ষে তো আমরা অতীশ দীপঙ্কর সম্বন্ধে বলতে গেলে কিছুই জানতাম না। পূর্ব বাংলার ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরে বজ্রযোগিনী গ্রামে 'অতীশের ভিটা' নামে ছোট্ট একটা ঢিবি ছাড়া আর কিছুই তার নামের বা কাজের বা ধর্মের পরিচয় বহন করছে না। এমন কি যে বিক্রমশিলা বিহারে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হিসাবে তাঁর বিশেষ লীলাক্ষেত্র ছিল, তা যে ঠিক কোথায়, তাও কেউ জানে না। সেটা গঙ্গার পারে মুঙ্গেরের কাছেই কোথাও ছিল, শুধু এইটুকুই জানা গেছে। আর তাঁর প্রধান শিক্ষাদানের স্থান বজ্রাসন (বুদ্ধগয়া) তো তুর্কী আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

এ যাবৎ আমরা অতীশ দীপঙ্করের যেসব কাহিনী-কথা পেয়েছি, সেগুলির মূল আকর হচ্ছে তিব্বতী রচনা। মঙ্গোলীয় ভাষায় তাঁর সম্পর্কে যেসব কথা পাওয়া গেছে, সেগুলিও তিব্বতীভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়েছিল। তাঁর রচনার বাংলা মূল যদিও পাওয়া যায়নি, তবে কোন কোন রচনার মূল সংস্কৃত পাওয়া গেছে বা গড়ে নেওয়া গেছে।

প্রধানত ভারতীয় রচনার তিব্বতী অনুবাদগুলি আমরা পাই একটি বিরাট সাহিত্য সংগ্রহে। তার নাম হল 'তাঞ্জুর'। অতীশের চরণে নিবেদিত কিছু কিছু স্তোত্র ও প্রার্থনা তিব্বতী ভাষায় ঐ সাহিত্য সংগ্রহের মধ্যে পাওয়া গেছে।

দীর্ঘ তের বছর ধরে দুর্গম তিব্বতে অতীশ যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই মঠ-মন্দির গড়ে উঠেছিল। আর সেই জায়গাগুলি পবিত্র পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল।

বাহাত্তর বছর বয়সে ১০৫৪ খ্রীস্টাব্দে অতীশ 'তুষিত'-লোকে অর্থাৎ পবিত্র পরলোকধাম স্বর্গে চলে গেলেন। অতীশের দেহরক্ষার পরে ফাগসোর্‌পো অর্থাৎ কল্যাণ মিত্র নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁর জীবনকাহিনী লিখতে চান। মহাপ্রভু দীপঙ্করের উনিশ বছরের যে সঙ্গী-লোচব, নাম তাঁর নাগচো, তখনও জীবিত ছিলেন। তিন বছর তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর কাছে শুনে শুনে এই ভিক্ষু অতীশের জীবনী রচনা করেন। সে আজকের কথা নয়। তিব্বতী ভাষায় গ্রন্থখানি রচনা সম্পূর্ণ হয় ১২৫০ খ্রীস্টাব্দে।

'তাঞ্জুর' সাহিত্য সংগ্রহ গ্রন্থটি চৌদ্দ শতকে আবার শুদ্ধ ক'রে নেওয়া হয়েছিল। তাতেই অতীশ দীপঙ্করের রচনাগুলি প্রথম থেকেই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তারও পরে বৌদ্ধধর্মে মহাজ্ঞানী একজন তিব্বতী পণ্ডিত বুস্‌টন রিন-পো-চে (১২৯০-১৩৬৪ খ্রীস্টাব্দ) 'ভারতবর্ষ ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' নামে একখানি গ্রন্থ লেখেন। রুশীয় পণ্ডিত রোরিখ প্রভৃতি অনেক তিব্বত-বিশেষজ্ঞ সেই গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণ প্রামাণিক এবং মূল্যবান ইতিহাস বলে মেনে নিয়েছেন।

তারও কয়েক বছর পরে গস্ নামে একজন লোচব অর্থাৎ তিব্বতী পণ্ডিত (১৩৯২-১৪৮১ খ্রীস্টাব্দ) 'নীল আখ্যান' নামে আরও একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

এর চার শ' বছর পরে অর্থাৎ আঠার শতকের মাঝামাঝি সুম্পা নামে এক তিব্বতী ঐতিহাসিক 'ইচ্ছাপূরণ তরু' নামে আরও একখানি গ্রন্থ লেখেন।

প্রথম বাঙালী তিব্বত-অভিযাত্রী শরৎচন্দ্র দাস ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে এই সব বই, বিশেষ ক'রে শেষেরটির ওপর নির্ভর ক'রে আমাদের

সামনে এই মহান্ বাঙালীর ইতিহাস তুলে ধরলেন। ১৮৭৮ সালে তিনি দলাই লামার কাছে আবেদন করেন এবং সেই নিষিদ্ধ দেশে ১৮৭৯ সালে প্রথম তিনি যান। ১৮৮১ সালে তাসি লামা তাঁকে আবার তিব্বতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

একটা অজানা দেশের রহস্য আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে এমন সুদীর্ঘ-কালব্যাপী তীর্থযাত্রার কাহিনী আর কখনো ইতিহাসে দেখা যায়নি।

সুদূর জার্মানীর বার্লিন শহরবাসী জার্মান পণ্ডিত কপ্পেন প্রথম তিব্বতের বাইরের একজন বিদেশী, যিনি ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে লামা ধর্মপ্রথা ও তিব্বতী মঠ ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর লেখা বইতে অতীশের অসামান্য গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে লেখেন।

কিন্তু শরৎচন্দ্র দাসের লেখা অতীশের জীবনী প্রকাশের আগে অতীশ সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষ বিশেষ কোনও নজর দেয়নি।

ফ্রাংক নামে আরও একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এবং ঐতিহাসিক তিব্বতের পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত তাঁর লেখা গ্রন্থটিতেও অতীশের জীবনের প্রামাণিক ঘটনাগুলি গ্রথিত করেছেন। অস্টিন ওয়াডেল নামেও একজন ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিক বিভিন্ন মূল তিব্বতী গ্রন্থ থেকে অতীশের জীবনী যাচাই ক'রে নিয়ে তাঁর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন।

অতীশের রচনার সংখ্যা আর সেগুলির ধর্মবিষয়ক মূল্য ছিল বিপুল। সেগুলি অবলম্বন ক'রেই উননব্বই জন ভারতীয় আচার্য তিব্বতে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় তিন পণ্ডিত ও প্রচারক ছিলেন শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, ও কমলশীল। তান্ত্রিক সাধনা আর অলৌকিক ক্ষমতার জন্য পদ্মসম্ভব সবচেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন। লামা তন্ত্রের মধ্য দিয়ে ধর্মচর্চা তিনিই চালু করেছিলেন। কিন্তু ধর্মনীতি ও চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল বৌদ্ধপ্রথার জন্য অতীশকেই দেবতার মতো সর্বত্র পূজা করা হয়।

লামারা অবশ্য বোধিসত্ত্বদের মধ্যে মঞ্জুশ্রীকেই সবার ওপরে আসন দেন। ব্রহ্মচর্যের, সৎ চরিত্রের এবং ব্রহ্মজ্ঞানের মূর্তপ্রতীকরূপে সকলে

তাঁর পূজা করে থাকেন। প্রকৃত পবিত্র ধর্মের বিধানে তিনিই শিরোমণি এবং তাঁরই অবতাররূপে তিব্বত অতীশকে বরণ করেছিল। মহাযানী বৌদ্ধেরাও মঞ্জুশ্রীকে ধর্মের স্বর্গীয় রক্ষক বলে মনে করে। তিব্বত, চীন, নেপাল ও ভারতেও এই মঞ্জুশ্রীর অবতার রূপেই অতীশ দীপঙ্কর পূজিত হয়ে থাকেন।

ভারতের নাম সব শেষে দিলাম, কারণ নিজের দেশেই তাঁর নাম লোকে প্রায় ভুলে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্র দাস তিব্বতী বই পড়েই প্রথম তাঁর কথা জানতে পারেন এবং তিনি দেশবাসী ও বিশ্ববাসীকে অতীশের এই মহান্ কাহিনী জানান।

অতীশের সাক্ষাৎ শিষ্য ব্রমটন এই বলে স্তোত্র রচনা করেছিলেন : 'আপনার মতো মহাপণ্ডিত ছাড়াও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম বেঁচে থাকতে পারত। কিন্তু লোকে তার গভীর তাৎপর্য বুঝতে পারত না। আপনিই তাদের সঠিক শিক্ষাদান করতে পেরেছেন। আপনার চরণে আমি প্রণিপাত করি।'

॥ ১৬ ॥

অতীশ দীপঙ্কর কি সত্যিই বাঙালী ছিলেন?

এই প্রশ্ন শুনে হঠাৎ যেন একটা হোঁচট খেতে হয়। অতীশ নাকি বাঙালী ছিলেন না।

তিব্বত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ একজন বাঙালী পণ্ডিত বাংলার একটি বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকায় সত্যিই লিখেছেন যে, তিনি 'আর্যভূমির পূর্বাঞ্চলে সম্ভবত সাহোরে' জন্মেছিলেন। আরেকজন বিখ্যাত পণ্ডিত বিহারের রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেন যে, তাঁর জন্মস্থান ছিল ভাগলপুর। 'বৌদ্ধধর্মের ২৫০০ বছর' নামে গ্রন্থটিতে তিনি লিখেছেন যে, প্রামাণিক তিব্বতী গ্রন্থগুলি পড়লে কোন সন্দেহ থাকে না যে, অতীশ ভাগলপুরে জন্মেছিলেন।...কিন্তু সেই গ্রন্থগুলি কি আর কোথায় পেলেন, তা কিছু লেখেননি।

আরও দু'-একজন বিদেশী পণ্ডিতও মনে করেছেন যে, অতীশের জন্ম উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে, বিশেষ ক'রে 'উদ্যান' নামে একটি জায়গাতে, অথবা 'মণ্ডি' নামে অন্য একটি জায়গাতে।

এদিকে আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি যে, অতীশ বাঙালী ছিলেন। সেকথা আমরা ছেলেবেলায় স্বদেশী গানে গেয়ে গেয়ে বেড়িয়েছি— হিমালয় লঙ্ঘন ক'রে বাঙালীর ছেলে তিব্বতে গিয়েছিলেন ধর্মপ্রচারে।

প্রথম বাঙালী বিশ্বমানব ছিলেন অতীশ। সেই তিনি নাকি আসলে বাঙালী নন!

ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা দরকার।

হায়, বাঙালী বুঝি কোনদিন ইতিহাস লেখেনি। বৃষ্টির জলে, নদীর বানে, ভেসে যাওয়া দেশে এমনিতেই কোন তাম্রশাসন বা পাথরে লেখা লিপি পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া আমরা কখনো নিজেদের ইতিহাস খুঁজে খুঁজে কষ্ট ক'রে বের করবার জন্য পরিশ্রম করিনি।

এমনকি, ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে বজ্রযোগিনী গ্রামে 'অতীশের ভিটা' নামে পরিচিত যে মাটির ঢিবি রয়েছে, সেটা পর্যন্ত খুঁড়ে তার নিচে কোন প্রমাণ মেলে কিনা, তাও দেখবার চেষ্টা এখনও হয়নি। বাঙালীদের মধ্যে প্রাচীন মহত্তম এক মহামানব সম্বন্ধে সেখানকার লোকমুখের কথাটুকু ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

অতীশ বাঙালী ছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে তথ্য খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই দেখব তাঁর সম্বন্ধে তাঁর মন্ত্রশিষ্য, তাঁর প্রবর্তিত বৌদ্ধমতের প্রতিষ্ঠাতা ব্রমটন কি বলেছেন। তিনি যা লিখেছিলেন, তা হল এই—

'আমি তাঁর চরণে প্রণিপাত করি
আর্য দেশে যাঁর নাম দীপঙ্কর
হিমবন্ত দেশে যাঁর নাম শ্রীমৎ অতীশ।'

এই আর্যদেশ যে ভারতবর্ষ, তা সকলেই জানে। কিন্তু অতীশের

জন্ম তার কোন্ অংশে ?

অতীশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'বোধিপথ-প্রদীপ'-এর যে টীকা ব্রমটন নিজে করেছিলেন, তার অনুলিপি পাওয়া গেছে আরও দূরের দেশে অর্থাৎ চীনে। তাতে প্রথমেই লেখা আছে রচনাকারীর নাম দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তার পর লেখা আছে— 'বর্তমান যুগে বঙ্গাল দেশে জন্ম নিয়েছেন ভগবান বুদ্ধের অবতার।'…'গ্রন্থখানি অনুবাদ ক'রে শুদ্ধ ক'রে নিয়েছিলেন ভারতীয় মহাপতি গুরু বোধিসত্ত্ব বঙ্গালী শ্রীদীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানপাদ আর লোচব ভিক্ষু জয়শীল।'

এই জয়শীল ছিলেন তিব্বতের তরুণ পণ্ডিত নাগচো। রাজার দূত হয়ে তিনি অতীশকে তিন বছর ধরে সাধ্য সাধনা ক'রে স্বদেশে নিয়ে যেতে রাজী করান। উনিশ বছর ধরে তিনি তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিলেন। তাঁর গুরু যখন বঙ্গালী, তখন দেখা দরকার বঙ্গাল কোথায় ছিল।

'বঙ্গাল' বলতে মোগলরা যাকে বলত 'সুবে বাংলা' বা ইংরেজরা বলত 'বেংগল', শুধু সেটুকু ধরে নিলে চলবে না। আর শুধু পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের মধ্যে তাকে ধরে রাখাও ঠিক হবে না। ইতিহাসের খেলায় বাংলার সীমানা ত বারে বার বদলিয়ে গিয়েছে। যে-বস্তু ঠিক রয়ে গেছে, বদলায় নি, প্রাণের জোয়ারে জীবন্তভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তা হচ্ছে বাঙালীর সংস্কৃতি।

তিব্বত সেটাই লক্ষ্য করেছে আর বাঙালী বলতে কাকে ধরা হয়, তা বুঝতে ভুল করেনি। একটা উদাহরণ ধরা যাক। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে চীনের সম্রাট হুয়াং তেরটি সোনার পাতে একখানি চিঠি লিখে তরুণ দলাই লামাকে ধর্মশিক্ষা দেবার আদেশ দেন। পাঞ্চেন লামার আদেশ মেনে ভুটানের রাজা তখন কোচবিহারের বন্দী রাজাকে মুক্তি দেন এবং কোচ রাজা 'বঙ্গাল দেশের অধিপতি' ওয়ারেন হেস্‌টিংসকে একটি আবেদন পাঠান। শেষ পর্যন্ত পাঞ্চেন লামার অনুরোধে বঙ্গালের অধিপতি ভুটানের ভূখণ্ড ছেড়ে দেন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, তিব্বত ও চীনের চোখে বঙ্গাল বলতে যা বোঝাত, তার মধ্যে বর্তমান.

পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ নিশ্চয়ই ছিল। তবে তর্ক উঠতে পারে যে, বিহার বা ভাগলপুরও আগে বঙ্গাল দেশের মধ্যে পড়ত।

এরপর তাহলে ভাগলপুরের কথায় আসা যাক্। গ্রন্থকার পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন স্বীকার করেন যে, রাজপুত্র (পরবর্তীকালে অতীশ) যখন অবধূত জেতারির কাছে উপদেশ নিতে যান, তখন জেতারি তাঁকে বলেন—'তোমায় প্রথমেই ভুলতে হবে যে, তুমি রাজার ছেলে, সেই অহঙ্কার ছাড়তে হবে। না হলে শিক্ষা হয় না, ধর্মশিক্ষা ত হয়ই না। কাজেই, তোমাকে পিতৃরাজ্য আর রাজধানী ছেড়ে অনেক দূরে চলে যেতে হবে।'

সেই হিসাবে, বিহারের ভাগলপুর অতীশের জন্মস্থান হলে সেখান থেকে বিহারের নালন্দা অর্থাৎ অতীশের শিক্ষালয় এমন কিছু দূর ছিল না। কিন্তু অতীশের প্রকৃত জন্মস্থান বাংলার বিক্রমপুর থেকে বিহারের নালন্দা সত্যিই ছিল বহু বহু দূরের জায়গা।

তিব্বতী ইতিহাস অনুসারে অতীশ ৯৮০ খ্রীস্টাব্দে গৌড়রাজবংশে বঙ্গের বিক্রমণিপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গুরুর গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হয়ত তিব্বতী ইতিহাসে তাঁর পিতার রাজ্য আর ঐশ্বর্যের কথা সাড়ম্বরে বর্ণনা করা হয়েছিল। তবে একথা ঠিক যে, বজ্রাসন অর্থাৎ বুদ্ধগয়া এবং নালন্দার পূর্বদিকে বহু দূরে অর্থাৎ বঙ্গদেশের বিক্রমপুরেই রাজার পুত্র হয়ে অতীশের জন্মগ্রহণের কথা তিব্বতী গ্রন্থগুলি পুরোপুরি সমর্থন করে।

এই সিদ্ধান্ত তিব্বতবিদ্ ওয়াডেল ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর লেখা 'তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম বা লামাধর্ম' নামে বইখানিতে সমর্থন করেছেন এবং বাঙালী তিব্বতবিদ্ শরৎচন্দ্র দাসের অভিমত সঠিক বলে মত প্রকাশ করেছেন। মূল আবিষ্কারের গৌরব অবশ্য শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়েরই, আর ওয়াডেল সাহেব লিখেছেন যে, শরৎচন্দ্র দাসের অভিমতটি মূল তিব্বতী পুঁথিগুলির সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই ক'রে তিনি সঠিক বলেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন। শুধু তাই নয়। প্রায় একশ বছর

আগে লেখা তাঁর ওই বইটিতে শরৎচন্দ্রের কাছে নিজের ঋণ খোলা মনে স্বীকার করে গেছেন।

দশ বছর পরে স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যাণ্ডের অভিযানের সঙ্গে তিনি আবার তিব্বতে যান। ততদিনে তিব্বতের ভাষা, ধর্ম আর ঐতিহ্যের সঙ্গে ওয়াডেলের আরও গভীর পরিচয় হয়েছে। তিনি আবার যাচাই ক'রে লিখেছেন যে, তাঁর আগের কোন সিদ্ধান্তই বর্জন করবার কোনও কারণ খুঁজে পাননি, অর্থাৎ তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত যে, অতীশের জন্মস্থান বঙ্গ দেশের বিক্রমপুরেই।

তার মানে এই যে, অতীশের জন্মস্থানের ব্যাপারে শরৎচন্দ্র দাস যে অতীশ-জীবনী ১৮৯৩ সালে 'জারনাল অব বুধিস্টিক সোসাইটি' নামে এক পত্রিকায় লিখেছিলেন, তার সমর্থন পাচ্ছি বিদেশী নিরপেক্ষ পণ্ডিতের কাছে।

বাংলা ১৩৪৮ সনে 'সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকায় ডক্টর শহিদুল্লা লিখেছিলেন যে, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের পাঁচ শিষ্যের মধ্যে ভুসুকু নামে এক শিষ্যের উল্লেখ করেন একজন তিব্বতীয় লামা তারানাথ। ঐ ভুসুকুর জীবৎকাল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগ। খুব সম্ভবত ইনিই চর্যাপদে উল্লিখিত ভুসুকু। তিনি ছিলেন এই বঙ্গাল দেশেরই একজন প্রাচীন কবি— যেমন, তাঁর গুরু দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশও ছিলেন এই বিক্রমপুরেরই প্রাচীন বৌদ্ধ আচার্য।

ইয়োরোপ আমেরিকার পণ্ডিতেরা শুধুমাত্র বাইরের বা ইতিহাসে পাওয়া প্রমাণের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করেন না। বিষয়বস্তুর ভিতর থেকে পরোক্ষ প্রমাণ দিয়েও প্রত্যক্ষ প্রমাণকে যাচাই ক'রে নিয়ে থাকেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন যে, তিব্বত রাজ-গ্রন্থাগারের যে গ্রন্থ-তালিকা বা 'তেঙ্গুর' প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকেও জানা যায়, চর্যাপদে উল্লিখিত লুই নামে ব্যক্তিটিও বাংলারই লোক। তিনি লিখেছেন— 'লুই-এর জীবৎকাল ঠিক করিতে হইলে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাহার একখানি গ্রন্থে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

সাহায্য করিয়াছিলেন। সে গ্রন্থখানির নাম "অভিসময় বিভঙ্গ"।' একই দেশের লোক এবং একই ভাষাভাষী না হলে এই সাহায্য সহজ বা সম্ভবও হয়ত হত না।

অতীশ যে বাঙালী ছিলেন তার একটি সম্পূর্ণ নতুন তিব্বতী প্রমাণ পাওয়া গেছে। এটি তিব্বতের মহাপণ্ডিত নাগোয়াং নিমা গবেষণা করে খুঁজে পেয়েছেন এবং অতীশের জীবনের বহু তথ্যসামগ্রী তিনি তিব্বতী প্রাচীন গ্রন্থগুলি থেকে উদ্ধার করেছেন। মূল গ্রন্থগুলির নামও তিনি দিয়েছেন। তাছাড়া অতীশ সম্বন্ধে যে সব জনশ্রুতি বা কাহিনী এখনো লোকমুখে প্রচলিত আছে, সেগুলিও তিনি বিবেচনা ক'রে দেখেছেন।

গ্রন্থখানি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিব্বতী অধ্যাপক লামা চিম্পা সংশোধন ক'রে যাচাই ক'রে নিয়েছেন। কাজেই, এই নতুন নিরপেক্ষ প্রমাণকে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট ব'লে কেউ বাতিল ক'রে দিতে পারবে না।

গ্রন্থখানিতে লেখা আছে যে, গৌড়ের (বঙ্গালের) কল্যাণশ্রী নামে একজন প্রবল শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন কুবেরের মতো ধনী। তাঁর প্রাসাদকে বলা হত 'ন শ' নিরানব্বইটি স্বর্ণপতাকার প্রাসাদ'— কারণ প্রাসাদের শীর্ষদেশে শোভা পেত সেই সুবর্ণমণ্ডিত নিশানগুলি।

সেই রাজা কল্যাণশ্রীর প্রধান রাণী শ্রীমতী প্রভাবতীর তিনটি ছেলে— দীপঙ্কর ছিলেন দ্বিতীয় ছেলে নাম চন্দ্রগর্ভ। প্রাসাদের উপরতলায় যখন তাঁর জন্ম হয়, তখন সঙ্গীতবাদ্যের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। রাজা এবং রাণী আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে, সদ্যোজাত শিশুটির সামনে একটি সদ্যপ্রস্ফুটিত পদ্মফুল যেন কোথা থেকে এসে পড়ল, আর শিশুটির সুন্দর মুখখানি দেখাচ্ছিল ঠিক তারা দেবীর মতো! সেজন্যই তারা দেবী ছিলেন দীপঙ্করের সারা জীবনের উপাস্য দেবী আর জন্মজন্মান্তর ধরে তাঁর কৃপা দীপঙ্কর পেয়েছিলেন।

বুদ্ধদেব এবং যীশুখ্রীস্ট যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে-সময়েও এমন অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছিল বলে কাহিনী প্রচলিত আছে। এসব ত আর যুক্তিতর্ক বা বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে যাচাই ক'রে নেওয়া যায় না। এগুলিকে মহাপুরুষদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের সময়ে মায়ের বা ভক্তদের বিশেষ অনুভব বলে ধ'রে নিতে পারা যায়। প্রত্যেক যুগেই, এমনকি এই শতকেও এই ধরনের কাহিনী তৈরি হয়ে থাকে। আর অনেক লোকই সে-সব বিশ্বাস করতে ভালবাসে।

অতীশের দার্শনিক মতবাদের মধ্যে জড়িয়ে আছে সমসাময়িক বাঙালী ধর্মপ্রচারকদের শূন্যবাদ। বাঙালী কবি আর সাধুসন্তরাই এই শূন্যবাদ প্রচার করতেন। অতীশ নিজে যে বাঙালী ছিলেন তার একটি আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হল এই শূন্যবাদ চর্চা—যা ছিল বাঙালীদেরই ভাবধারার পরিচায়ক।

ইয়োরোপীয় পণ্ডিত কর্দিয়ে চর্যাগীতিগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা সংকলন করেছিলেন। তার মধ্যে অতীশের চর্যাগীতির নাম থাকলেও সেই গীতির পাঠ আমরা পাইনি। আর আমরা নিজেদের দেশে তো কিছুই পাইনি। যা কিছু তথ্যসামগ্রী, পুরনো পুঁথি সবই আসলে অথবা অনুবাদে পাওয়া গেছে নেপালে, তিব্বতে, চীনে, এমনকি মঙ্গোলিয়ায়। কিন্তু তিব্বতের রাজদরবারের গ্রন্থাগারের গ্রন্থতালিকায় অর্থাৎ 'তাঞ্জুর'-এ আছে 'অতীশ চর্য্যাসংগ্রহ-প্রদীপ'। চর্যা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে বাংলা গীতি কবিতা। অতীশ যে সময়ে জন্মেছিলেন সেই সময়ে ঐ চর্যাগীতির ব্যাপক প্রচলন ছিল।

আরও প্রমাণ হচ্ছে তাঁর রচিত বহু সংকীর্ত্তনের পদ, তাঁর রচিত 'বজ্রাসন গীতি', 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ধর্মগীতিকা', 'বলবীর সাধন' এবং 'বলবিধি' গ্রন্থগুলি। কিন্তু সেই সব গ্রন্থের মূল বাংলা রচনা এখনো পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে শুধু দূরদূরান্তর দেশের ভাষার অনুবাদে। কিন্তু সংকীর্ত্তন যে বাঙালীর প্রাণের ধন, তার কি কোন প্রমাণের দরকার আছে?

সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে মুখের ভাষা, মায়ের কোলে যে-ভাষা শেখা হয়, সেই ভাষা। অতীশের রচনা তিব্বতী, চীনা ও মঙ্গোলিয়ান ভাষায় আমরা পেতে পারি, কিন্তু তাঁর নিজের মুখের ভাষার চেয়ে, বড় প্রমাণ কি হতে পারে? তাঁর ঊনিশ বছরের সঙ্গী পণ্ডিত নাগচো যেভাবে মুখে মুখে অতীশের জীবনী বলে গিয়েছিলেন এবং এক তিব্বতী ভিক্ষু তাই শুনে প্রথম যে অতীশ-জীবনী লিখেছিলেন, তাতে অতীশের একটি উক্তি আছে—'অতি ভাল, অতি ভাল হয়, অতি মঙ্গল'। এই ধরনের বাণীর মধ্যে দিয়ে অতীশ মনের ভাব বা আনন্দ প্রকাশ করতেন। এর মধ্যে 'মঙ্গল' কথাটি না হয় সংস্কৃতমূলক; অবাঙালীরাও ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু 'ভাল' যে একেবারে বাঙালীর মুখের কথা। অতীশ নিজে উচ্চারণ না করলে সে-কথা তাঁর সঙ্গীরা বা জীবনীকার নিজে থেকে জানতে পারতেন না।

শেষ কথা এই যে, নাগচো বর্ণিত অতীশ-জীবনীতে এবং তিব্বত দেশের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস 'সুম্পাত' গ্রন্থে যে বিক্রমপুর (বিক্রমশিলা নয়) অতীশের জন্মস্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তার ঐতিহাসিক এবং আভ্যন্তরীণ প্রমাণ পুরোপুরি মিলেছে। ওয়াডেল, যাস্কে, কর্দিয়ে আর তিব্বত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ অনেক বিদেশী নিরপেক্ষ পণ্ডিতেরাও সেই সব প্রমাণ সমর্থন করেছেন।

এখানে সব শেষে কিন্তু পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাসহকারে স্বীকার করতে হবে আমাদের ঋণ একজন বাঙালীর কাছে। তাঁর নাম আমরা এখন প্রায় ভুলেই গেছি।

অতীশ দীপঙ্করের জীবৎকালের প্রায় ন শ' বছর পরে অর্থাৎ এখন থেকে এক শ' বছর আগে তিব্বতকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করেন সেই বাঙালী শরৎচন্দ্র দাস। সে-যুগে তিব্বতে ঢোকা সম্পূর্ণ বারণ ছিল। তিব্বত কোনও বিদেশীকে সে-দেশে ঢুকতে অনুমতি দিত না। শরৎচন্দ্র দাস সাধারণ বাঙালী হয়ে সামান্য চাকুরি করেও কেবল অন্তরের টানে আর জ্ঞানসংগ্রহের প্রেরণায় ঐ দুর্গম অজ্ঞাত দেশে যাওয়ার অনুমতি

চান এবং ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাশি লামার আমন্ত্রণে সে-দেশে যান। এই যোগাযোগ সম্ভব হয়েছিল তাঁর নিজেরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

অন্যদিকে ব্রিটিশরাজকে তিব্বত খুব সন্দেহের চোখে দেখত। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে অনেক দাপটের সঙ্গে স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যাণ্ড যে অভিযান তিব্বতে নিয়ে গিয়েছিলেন, তার মধ্যেকার দু'জন ইংরেজ সে-দেশ সম্বন্ধে অনেক কুৎসাই লিখে গিয়েছেন।

সেই বিরুদ্ধ পরিবেশেও বাঙালী অভিযাত্রী পণ্ডিত শরৎচন্দ্র দাস রহস্যময় লাসার বর্ণনা আর তিব্বতের যে প্রকৃত পরিচয় দিয়ে গেছেন, তা তখনকার সাম্রাজ্যবাদী বিলেতেও সকলের প্রশংসা অর্জন করে। ইংলণ্ডের 'নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুরি' পত্রিকা আর পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন সংবাদপত্র 'লণ্ডন টাইম্স্' উচ্ছ্বসিতভাবে সে সম্বন্ধে প্রশংসামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল।

'টাইম্স্' লিখেছিল—'অতি সামান্য কয়েকজন বাঙালী পণ্ডিত আছেন, যাঁরা ইয়োরোপের বিদেশ আবিষ্কারকদের চেয়েও অনেক বেশি গুণবৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁরা বিনয়নম্র মধুর ব্যবহার দিয়ে বিরোধ আর সন্দেহকে জয় করতে পারেন। তাঁদের কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা আর দৃঢ় কর্তব্যবোধ সব বাধাকে জয় করতে পারে, যা আমাদের (অর্থাৎ ইয়োরোপীয়দের) মধ্যে নেই। শরৎচন্দ্র দাসকে বৌদ্ধ পণ্ডিত আর রাজকর্মচারীরা সবাই খুশি মনে সাহায্য—সহযোগিতা করেছেন। স্বয়ং দলাই লামা তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বৌদ্ধ বিষয়ে পাণ্ডিত্যের জন্য পূজা পেয়েছেন তিনি।

শরৎচন্দ্র দাস সম্পর্কে এত কথা লেখার দরকার আছে শুধু তাঁর কীর্তি এ যুগে স্মরণ করবার জন্য নয়—অতীশ দীপঙ্কর যে বাঙালী এ সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত যে সঠিক আর অনেক মৌলিক গবেষণার ফলেই সেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল, তা বোঝাবার জন্য।

বাঙালী তার নিজের এমন বিজয়গৌরব ভুলে থাকলে মনে হয়

সে নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। এসব কাহিনী পড়লে প্রত্যেক বাঙালীর মনে সেই হারানো আত্মবিশ্বাস যেন শতগুণে বৃদ্ধি পেয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

—



বাঙালীর গৌরব অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান-এর বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিব্বত পাড়ি দেওয়ার রোমাঞ্চকর গল্প এই 'রাজার কুমার পক্ষিরাজে'। অতীশ যে প্রথম বাঙালী 'ইউনিভার্সাল ম্যান', তাঁর শিক্ষা, নীতি সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য, কিংবা অতীশের দশবিধির সঙ্গে বাইবেলের টেন কমান্ডমেন্টগুলির যে আশ্চর্যরকম মিল আছে—এসব আগে জানাই ছিলনা। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রাক্তন স্থায়ী সভাপতি এবং অবসর প্রাপ্ত আই সি এস দেবেশ দাশ এই বইটিতে অতীশের মহান জীবনীর সরল রূপায়ণ করেছেন সহজ ভাষায়। আর মহামান্য দলাই লামা স্বয়ং এর ভূমিকা লিখে তাঁকে আন্তর্জাতিক সম্মান দিয়েছেন।

ওরিয়েন্ট লংম্যান

Rs 12/-

Das: Rajar Kumar Pakshiraje

ISBN 0 86131 911 7